
খেলাধুলার
আধুনিক
নিয়ম কানুন

খেলাধুলার আধুনিক নিয়ম-কানুন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্দিষ্ট **১৯৭৪ সালের** নূতন শিক্ষাক্রম-অনুসারে লিখিত নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের **ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর** ছাত্র-ছাত্রীদের শারীর-শিক্ষা ও খেলাধূলার অসাধারণ গ্রন্থ

খেলাধূলার

আধুনিক নিয়ম-কানুন

(প্রথম ভাগ)

চিরঞ্জীব

'জয় থেকে জয় ক্রিকেটে', 'স্পোর্টস ডায়েরি', 'কানোজি আংরে', 'সেরা সেরা খেলোয়াড়,' 'খেলাধূলার আধুনিক নিয়ম-কানুন' (২য় ভাগ) ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক ও আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া-সাংবাদিক

ও

শ্রীরঞ্জিত

গড়িয়া দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার ক্রীড়া-সাংবাদিক।

সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ—১৯৭৪

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩
দ্বিতীয় সংস্করণ :
২১শে জানুয়ারী, ১৯৭৪
তৃতীয় সংস্করণ :
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
চতুর্থ সংস্করণ :
১২ই মার্চ, ১৯৭৪

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস
ভিতরের ছবি : প্রবীর কর্মকার

মুদ্রণে :
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মূল্য : চার টাকা মাত্র

নিবেদন

ক্রীড়া-সাংবাদিক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে দেখেছি প্রধান প্রধান খেলাগুলির নিয়ম-কানুন সম্বলিত একক বই বাংলাভাষায় নেই (ইংরেজিতেও নেই)। কিছু কিছু খেলা নিয়ে রচিত যে দু'একখানি বই ইংরেজিতে আছে, সেগুলিতে হয় আইনের সমস্ত নতুন সংশোধন বা পরিবর্তন-গুলি খুঁজে পাওয়া যায় না, কিংবা সমস্ত তথ্য নির্ভুলভাবে পরিবেশিত হয়নি। ইচ্ছা ছিল, ধীরে-সুস্থে সর্বাধুনিক একখানি পুস্তক রচনা করব—সব খেলার আইন-কানুনের ধারা-উপধারা নিয়ে। কিন্তু সে কাজ করার আগেই—**বর্তমান (১৯৭৪) শিক্ষাবর্ষ থেকেই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ রাজ্যের নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শারীর-শিক্ষা ও খেলা-ধুলা আবশ্যিক করে দিলেন।** নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত খেলাধূলা ও শরীর-চর্চা করতে হবে। তবে এখনকার শরীর-চর্চা আর আগের মত শুধু 'লেফ্‌ট, রাইট' বা 'লেফ্‌ট টার্ন,' 'অ্যাবাউট টার্ন'-এ সীমাবদ্ধ নয়। এবারকার খেলাধূলা সার্বিক ফিজিক্যাল এডুকেশন (পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়ে যা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাস্তর পর্যন্ত আবশ্যিক)।

সুতরাং এ-ধরনের বইয়ের প্রয়োজন আরও বেড়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের খেলা-ধূলার নিয়ম-কানুন অবশ্যই জানতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই এই বই লেখা। এই বই সাধারণ ক্রীড়ামোদীদেরও বহু সমস্যার সমাধান করবে, নিরসন করবে বহু তর্ক-বিতর্কের। খুব দ্রুত লেখা হলেও সহজভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আইনের সর্বশেষ সংশোধন ও পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনমত যথাসম্ভব ডায়াগ্রাম (আরও দিলে ভাল হত), স্কেচ ইত্যাদি বইয়ে রেখেছি।

একথা ঠিক, অধিকাংশ স্কুলেরই খেলার জন্য মাঠ, এক টুক্‌রো জমি বা জিমন্যাসিয়াম নেই, রাজ্যের অসংখ্য স্কুলে শিক্ষণপ্রাপ্ত ক্রীড়া-শিক্ষকেরও অভাব।—একথা আমাদের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি. ভি. গিরিও স্বীকার করেছেন। কিন্তু সকলকেই ক্রিকেট, ফুটবল, হকি বা টেনিস খেলতে হবে কেন? স্বল্প খরচে, ছোট জায়গায় যোগব্যায়াম, খো-খো, কবাডি, ভলিবল ইত্যাদি অনেক খেলাই তো খেলা যায়। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে ধন্যবাদ, তাঁরা সমস্ত অবস্থা বিবেচনাসাপেক্ষে সিলেবাস তৈরি

করেছেন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনের বিজয়-স্তম্ভে দাঁড়াতে গেলেও খেলাধূলা শুরু করা উচিত বিদ্যালয়-স্তর থেকেই। রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, জাপান, জার্মানী আজ এই পথেই বিভিন্ন বিভাগে শীর্ষস্থান দখল করছে। তাই আজ অনেক শ্লোগানের চাইতে যে শ্লোগানটি বেশি দরকার তা হল, 'নেই খেলা নেই কাজ, সেই জাতি পায় লাজ।'

আর খেলাধূলার এই গুরুত্বের কথা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীনুরুল হাসান, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও ভোলেননি। আমরাও দেখেছি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় কীভাবে গোটা জাতিকে নাড়া দেয়। ক্রিকেটের জয়ে সারা ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা উল্লসিত হন, হকির পরাজয়ে সকলকে বিষণ্ণ দেখি।

এই বই প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত; তাদের কাজে লাগলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। বইখানি রচনার ব্যাপারে বহু বন্ধু ও সুধীজনের পরামর্শ পেয়েছি। সাহায্য করেছেন রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান এবং কিছু ক্রীড়া-আইন বইয়ের লেখক।

রবীন্দ্র লাইব্রেরীর কর্ণধার শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সেখানকার কর্মীদের সাহায্য ছাড়া বইখানি এত তাড়াতাড়ি আলোর মুখ দেখতে পেত না। এঁদের সকলের কাছেই আমরা উভয়ে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি—আলোচিত কোনো বিষয় সম্পর্কে আরও জ্ঞাতব্য কিছু থাকলে, তাঁরা যেন প্রকাশকের ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যদি কোনো ভুল-ত্রুটি কারও নজরে পড়ে, আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব।

কলকাতা
১২ই ডিসেম্বর/১৯৭৩

বিনীত
গ্রন্থকারদ্বয়

সূচীপত্র

শারীর-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে অনেকের একটা ভুল ধারণা ছিল। তা হল শিক্ষা বা 'লেখাপড়া' মানেই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার বইগুলি পড়ে পরীক্ষায় পাশ করা। শিক্ষা যে শুধু মনেরই নয়,—সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও, এই চেতনাটা ভারতবাসীর খুব বেশিদিন হয়নি। অবশ্য এর জন্যে ভারতবাসীর দোষই বা আর কতটুকু? ভারতবর্ষ মাত্র ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন হয়েছে, তার আগে পর্যন্ত ইংরেজদের পদানত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ-প্রভুরা ভারতের ছেলেমেয়েদের শারীর-শিক্ষা নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামায়নি। বরং সুস্থ, সবল ও সুন্দর দেহের অধিকারী ছেলেমেয়েরা ব্রিটিশ শাসকদের চোখে সন্দেহভাজন ছিল। তারা ভাবত, ওরা বিপ্লবী নয় তো? এ-রকম ধারণা করার অবশ্য কারণ ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যেত, স্বাধীনতা-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী ভারতীয়রা—বিশেষ করে তখনকার বাংলা-দেশের ছেলেমেয়েরা—তাদের গোপন আস্তানায় রীতিমত শরীর-চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। সে যুগের বিপ্লবীদের দূরদর্শিতা ছিল অসাধারণ।

আসলে শরীর ও মন এই দুই নিয়েই মানুষ। একটির বিকাশের উপর আর একটির বিকাশ নির্ভরশীল। কারও অনেক শিক্ষাগত ডিগ্রী থাকতে পারে, কিন্তু সে দুর্বল ও চিররুগ্ন হলে তার লাভ কী? সারাদিন বসে বসে শুধু পড়াশোনায় ডুবে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় আক্ষেপ করে বঙ্গ-জননীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :

'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি!'

এই 'মানুষ' হওয়ার জন্যই শারীর-শিক্ষা দরকার। শারীর-শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে অবশ্য শারীর-শিক্ষার আদর বহুদিনের। ইংরাজীতে বলা হয়ঃ 'All work and no play makes Jack a dull boy', অর্থাৎ কেউ যদি শুধু কাজই করে এবং খেলাধূলার ধার দিয়েও না যায়, সে শেষ পর্যন্ত একটা গবেট হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে যে, প্রায় তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীসে শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল শরীর-চর্চা। গ্রীকদের লক্ষ্য ছিল 'পরিপূর্ণ মানুষ' তৈরি করা। তাই তখনকার 'পলিস' অর্থাৎ গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলিতে শরীর-চর্চার জন্য অনেক জিমন্যাসিয়াম ছিল। এই গ্রীসেই ওলিম্পিয়া নগরের দেবতা জীউসের সম্মানার্থে ক্রীড়ানুষ্ঠান হত, যার থেকে আধুনিক 'ওলিম্পিক গেমসে'র উৎপত্তি।

এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, স্বাধীন ভারতেও শারীর-শিক্ষার উপর যতটা নজর দেওয়া উচিত ও সম্ভব ছিল, ততখানি দেওয়া হয়নি। এ পর্যন্ত মাত্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড় শারীর-শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় বলে ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ শারীর-শিক্ষাকে নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে বহুদিনের একটি অভাব দূর করে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে শারীর-শিক্ষার স্নাতকোত্তর শিক্ষাকেন্দ্রটিকে কাঁকুড়গাছি থেকে বাণীপুরে নিজস্ব বাড়িতে এনে তার উন্নতি বিধান করা হচ্ছে। এছাড়া ১৯৬৪ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর একটি এরকম শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলায় খেলাধূলা পরিচালনার জন্য স্কুল ক্রীড়া-সংস্থা এবং যুব-সংস্থাগুলির কাজ পরিচালনার জন্য যুবকল্যাণ পরিষদ আছে। মেয়েদের গাইডিং, ব্রতচারী বা পর্বতারোহণের জন্যও সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। আর পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকদের পর্যটনে উৎসাহ দেবার জন্য ১৫টি 'ইয়ুথ হোস্টেল' বা যুব-নিবাস আছে।

শারীর-শিক্ষা এবং শরীর-চর্চার উদ্দেশ্য শুধু দেহে বল বৃদ্ধি করা নয়। মন এবং হৃদয়কে সুশিক্ষিত না করে শুধু দেহের শক্তি বাড়িয়ে গেলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পাশবিক-বৃত্তিতে উৎসাহিত হয়। কেউ যদি শরীর-চর্চা করে গুণ্ডা তৈরি হয়ে সমাজে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে সে ক্ষেত্রে দোষটা শিক্ষার নয়, দোষ সেই ব্যক্তিরই। সে-ই প্রাপ্ত শিক্ষাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারল না। সুতরাং শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সৎবৃত্তিগুলির চর্চা করতে হবে, যাতে শারীর-শিক্ষা বিফলে না যায়।

সুতরাং মন ও শরীরকে আদর্শরূপে গড়তে হলে চাই উপযুক্ত শারীর-শিক্ষা। মন ও শরীরের সুস্থতা ছাড়া কখনও কোনও বিষয়েই সাফল্য পাওয়া যায় না। এইজন্যে গোড়া থেকেই এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। তা না হলে 'গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া'র মতই মূর্খতা করা হয়। এতদিন ভারতে এদিকটা একেবারে অবহেলিত ছিল বলেই পৃথিবীর অধিকাংশ শরীর-চর্চার ও খেলাধূলার আসরে ভারত নৈরাশ্যজনক ফল পেয়েছে এবং তার থেকেও বড় কথা, উপযুক্ত শারীর-শিক্ষার অভাবে দেশের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ নৈতিক চরিত্রহীন, অসংযমী, উচ্ছৃঙ্খল, কর্মবিমুখ ও দুর্বল হয়ে পড়ে রয়েছে।

তোমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ভবিষ্যৎ। দেশ তোমাদের কাছে অনেক কিছুই আশা করে। কামনা করি, উপযুক্ত শারীর-শিক্ষা লাভ করে খেলাধূলা ও শরীর-চর্চার মাধ্যমে তোমরা অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হও এবং দেশও তোমাদের শারীর-শিক্ষার সুফল ভোগ করুক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্যালিস্থেনিকস্

'ক্যালিস্থেনিকস্' কোনও বিশেষ একধরনের ব্যায়াম নয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সৌন্দর্য ও শক্তিলাভের জন্য যে সব ব্যায়াম করা হয় সেই সবই ক্যালিস্থেনিকসের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যে-সব ব্যায়াম খালি-হাতে করা যায়—করতে গেলে কোনও যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় না ('ফ্রী-হ্যাণ্ড' ব্যায়াম) বা নিতে হলেও হাতে ব্যবহার করার হাল্‌কা ধরনের যন্ত্র, সেগুলিকেই এক কথায় ক্যালি-স্থেনিকস্ বলা হয়।

উপরেই বলা হয়েছে যে, ক্যালিস্থেনিকসের লক্ষ্য—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যলাভ। 'ক্যালিস্থেনিকস্' শব্দটির উৎপত্তি লক্ষ্য করলেই এ-কথা বোঝা যায়। দু'টি গ্রীক শব্দ, 'কেলস্' এবং 'স্থেনস্', মিলে এই নতুন শব্দটির উৎপত্তি। যাদের অর্থ যথাক্রমে 'সুন্দর' এবং 'শক্তি'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ক্যালিস্থেনিকস্ বলতে প্রধানতঃ 'ফ্রী-হ্যাণ্ড' বা খালি-হাতের ব্যায়ামই বোঝাচ্ছে। ডন, বৈঠক, যোগ-ব্যায়াম—এ-সমস্তই খালি হাতের ব্যায়াম। এখন প্রশ্ন হল—যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যায়াম করা ভালো, না খালি-হাতে ব্যায়াম করা ভালো?

খালি-হাতের ব্যায়ামের সাহায্যে দেহ পুষ্ট ও সুন্দর মাংসপেশী-যুক্ত হয়, দেহে অতুলনীয় বলবীর্য সঞ্চিত হয় এবং শারীরিক সৌষ্ঠব ও দীপ্তি বাড়ে। অপরদিকে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে-সব ব্যায়াম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে—যেমন, মুগুর, ডাম্বেল, বারবেল, বার, রিং ইত্যাদির ব্যায়াম—এগুলির সাহায্যে দেহ তাড়াতাড়ি পুষ্ট হয় এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্রমাগত এই একই ব্যায়াম করলে মাংসপেশীগুলি অত্যধিক পুষ্ট এবং শক্ত হয়ে দেহের সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলতে পারে।

পাশ্চাত্যের শরীর-চর্চাকারী মূলার খালি-হাতের ব্যায়াম সমর্থন করতেন। আমাদের দেশেও মল্লবীর বা কুস্তিগীররা খালি-হাতে ব্যায়াম করেই বিখ্যাত হয়েছেন।

আসলে দু'রকমের ব্যায়ামেরই প্রয়োজন আছে। তবে এ-ব্যাপারে জোর করে কিছু করা উচিত নয়। যারা শিখছে তাদের রুচি অনুযায়ী খালি-হাতে বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে—যে কোনও উপায়ে যার যে ব্যায়ামে রুচি হয়, তাকে প্রথমে তাই করতে দেওয়া উচিত। যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যায়াম করতে হলে প্রথমে সহজভাবে স্বল্পভার যন্ত্রপাতি নিয়েই করা উচিত।

ড্রিল/মার্চিং

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধ। আর এই সুশৃঙ্খল জীবন শুরু হয় প্রতিটি উন্নত দেশে বাল্যকালে ও ছাত্রাবস্থায়।

ড্রিল এ-কাজে সাহায্য করতে পারে। ড্রিল নৈতিক উন্নতি ঘটায়। তবে ড্রিল ও মার্চিং-এর নির্দেশের ('ইনস্ট্রাকশন') দিকে নজর রাখতে হবে সর্বদা। এবং প্রতিটি নির্দেশ নির্ভুলভাবে পালন করা একান্ত কর্তব্য।

ড্রিল শুরুর আগে কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন। যথা:

(ক) প্রত্যেককে চটপটে হতে হবে।

(খ) নির্ভুল নির্দেশ দিতে হবে।

(গ) প্রতিটি নির্দেশের আগে-পরে সামান্য বিশ্রাম দিতে হবে।

(ঘ) পোশাক একই ধরনের হলে উত্তম। তা সম্ভব না হলে সর্বদা পরিচ্ছন্ন পোশাক প্রয়োজন।

ড্রিলের সবচেয়ে দরকারী নির্দেশ—**সাবধান বা অ্যাটেনশন্** অবস্থা। সাবধান শুনলেই দুই গোড়ালি একলাইনে থাকবে। আর দুই পায়ের পাতা ৩০ ডিগ্রি অবস্থায় রাখতে হয়। হাঁটু, মেরুদণ্ড ও কাঁধ সোজা করে সামনের দিকে তাকাতে হবে। তখন হাত দু'খানি দেহের দু'দিকে উরুতে লাগানো থাকে। শরীরের ভারসাম্য রাখা হয় দু'পায়ের উপর।

বসে যাও: এই নির্দেশ শোনা মাত্র সকলকে এমনভাবে বসতে

হবে যে, ডান পায়ের গোড়ালি বাঁ দিকে ও বাঁ পায়ের গোড়ালি ডান দিকে আসবে। আর হাত দু'টি সোজাসুজি দুই হাঁটুর উপর থাকবে। কোমর থেকে গোটা শরীর সোজা থাকবে এবং সামনের দিকে তাকাতে হবে।



দাঁড়িয়ে পড় বা সাবধান

দাঁড়িয়ে পড় ঃ একথা বলা মাত্রই লাফ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিছনে ঘোর ঃ এক—এবার বাঁ পায়ের পাতার সামনে এবং ডান পায়ের গোড়ালিতে ভর করে ডান দিক দিয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যেতে হবে।

দুই—এবার বাঁ পা প্রায় ছয় ইঞ্চি উঁচু করে ডান পায়ের কাছে এনে দাঁড়াতে হবে। এই সময় শরীরের ভারসাম্য ডান পায়ের উপর পড়ে।

ডাইনে বা বাঁয়ে ঘোর ঃ দু'দিকেই ঘুরতে গেলে হাঁটু সোজা রাখতে হবে। তবে ডান দিকে গেলে শরীর সোজা রেখে বাঁ পায়ের পাতার সামনে এবং ডান পায়ের গোড়ালিতে ভর করে ৯০ ডিগ্রি ঘুরতে হবে। শরীরের ভার থাকে ডান পায়ের গোড়ালিতে। তারপর বাঁ পা পনের সেন্টিমিটার বা ছয় ইঞ্চি তুলে ডান পায়ের কাছে এনে দাঁড়াতে হবে। বাঁ দিকে ঘুরতে হলে সব কাজ বিপরীতভাবে করতে হবে।

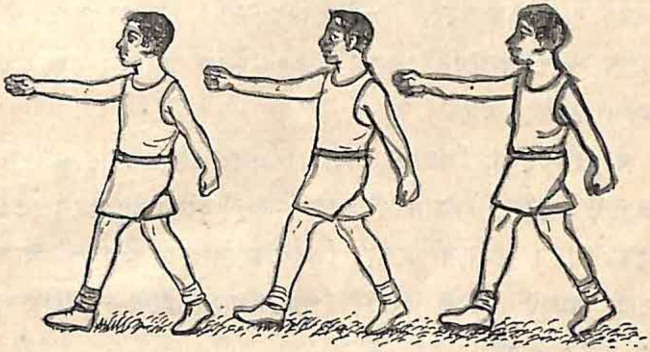


স্যালুট

স্যালুট ঃ ডান হাত বৃত্তাকারে মাথার কাছে আনতে হবে হাতের আঙুলগুলি তখন সবচেয়ে কাছাকাছি সোজা এবং ডান হাতের কব্জি ও কাঁধ যেন সোজা ডাইনে থাকে। স্যালুটের সময় ডান চোখ থেকে বুড়ো আঙুল মাত্র এক ইঞ্চি বা ২.৫ সেন্টিমিটার দূরে থাকবে।

এক লাইনে দাঁড়াও: এই নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছাত্ররা একই লাইনে দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকের দূরত্ব হয় এক কাঁধ। তারপর গুনতে বলা হলে ডান দিক থেকে 'এক, দুই, তিন' করে গোনা শুরু করতে হয়।

ধীরে চলো: এই কথা শুনেই আগে বাঁ পা বাড়িয়ে এগুতে হয়। শরীর থাকবে সোজা। হাত দু'টি শরীরের দু'দিকে। পা



মার্চিং

বাড়াতে হয় আনুমানিক ৩৮ সেন্টিমিটার। 'এক' বললেই বাঁ পা মাটিতে পড়বে, 'দো' বা 'দুই' বললে ডান পা মাটিতে পড়বে। এই-ভাবে যেতে হবে। তবে কখনও যেন হাত নড়াচড়া না করে। 'থাম' বললেই ডান পা মাটিতে ফেলে চলা বন্ধ করতে হয়। তবে তার আগে 'সাবধান' বলা হয় এবং 'এক', 'দো' (বা দুই) গুনেই সকলের পা থামে।

ধীরে চলার সময়েই তালে তালে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশের সঙ্গে বলা হয় 'আগে চলো'। 'আগে' বললেই ডান পা তুলতে হবে, আর 'চলো' বললেই ওই পা মাটিতে পড়বে। তারপর বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে চলতে হবে। এর সঙ্গে দ্রুত চলার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। 'দৌড়ে চলো'র নির্দেশ দিলে কনুই বেঁকে যাবে এবং কনুইয়ের নিচে ও ওপরের অংশে প্রায় ১৩৫ ডিগ্রি কোণ তৈরি হবে। এই সময় মাথা কিন্তু সোজাই থাকে।

দ্রুত চলতে চলতে 'থাম' নির্দেশ আসে যখন, তখন সকলের আগে ডান পা মাটি স্পর্শ করে।

ধীরে চলো, ডাইনে ঘোর : ধীরে চলার সময় ডাইনে ঘোরার নির্দেশ আসে তখনই, যখন ডান পা বাঁ পা-কে অতিক্রম করে। ওই সময় শুধু 'ডাইনে' বলা হয়। 'ঘোর' বলা হয়—যখন বাঁ পা ডান পা-কে অতিক্রম করে। ওই সময় ডান পায়ের পাতা বাঁ পায়ের মধ্যাংশ স্পর্শ করবে। তখনই ৯০ ডিগ্রি ডাইনে ঘুরতে হবে এবং ডান পা এগিয়ে যাবে।

ধীরে চলো, পিছনে ঘোর : ধীরে চলার সময় ডাইনে ঘোরার জন্য এই নির্দেশ। ডান পা ফেলা সম্পূর্ণ হলে, বাঁ পায়ে ভর করেই ঘুরতে হবে। 'ধীরে চলো' তিনবার বলতে যতক্ষণ লাগবে তার মধ্যেই সম্পূর্ণ ঘুরতে হয়। পিছনে ফেরা হলে চতুর্থবার পা পড়বে এবং এটি হবে ডান পা।

দ্রুত চলো, ডাইনে ঘোর : যখন 'ডাইনে' নির্দেশ উচ্চারিত হবে, তখন বাঁ পা-কে ডান পা অতিক্রম করে এবং 'ঘোর'র সঙ্গে সঙ্গে ডান পা বাঁ পা-কে অতিক্রম করে। এবার বাঁ পা তুলে ডান পা-র সঙ্গে মেশাতে হবে। তখন দুই পা-র মিলন ইংরাজী 'টি' অক্ষরের মত যেন হয়। এবার ডান দিকে ৯০ ডিগ্রি ঘুরতে হবে। দ্রুত চলতে হবে ডান পা ও বাঁ হাত আগে বাড়িয়ে। হাত দু'খানি নিচে নামবে শরীর থামার সঙ্গে সঙ্গে।

ছোট পা বা ছোট কদম : এবার আর দ্রুত চলা নয়। 'ছোট' বলা হয় তখনই, যখন বাঁ পা মাটিতে পড়ে ও ডান পা উপরে ওঠে। 'কদম' বা 'পা' নির্দেশ হলেই ডান পা ৭৬ সেন্টিমিটারের বদলে ৫৩ সেন্টিমিটার এগিয়ে যাবে। 'লম্বা কদম' বা 'লম্বা পা' বললে ৭৬ সেন্টিমিটারের বদলে ৮৩ সেন্টিমিটার দূরে দূরে পা ফেলতে হবে।

'কদম' বদল বা পা বদল : এই নির্দেশের পরেই 'এক' বললে বাঁ পা ডান পা থেকে ৭৬ সেন্টিমিটার এগিয়ে মাটিতে পড়বে। ডান

হাত এগিয়ে যাবে এবং বাঁ হাত শরীরের সঙ্গে লেগে থাকবে। 'দুই' বা 'দো' বললে ডান পা বেঁকবে, যাতে ওই পা সোজাসুজি মাটিতে পড়ে এবং দু'হাত শরীরের সঙ্গে দু'ধারে লেগে থাকবে।

পিছনে যাও ঃ অ্যাটেনশান্ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় সাধারণতঃ এই নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয় 'এক পা, দুই পা আগে চলো, পিছনে যাও' ইত্যাদি। আগে বা পিছনে যেখানেই যেতে বলা হোক না কেন, সব সময় বাঁ পা আগে বাড়াতে হবে, তারপর ডান পা নিয়ে বাঁ পা-র সঙ্গে যোগ করতে হয়।

দুই পা বাঁয়ে বা ডাইনে চলো ঃ এবারে প্রথমে বাঁ পা বাঁ-দিকে আনুমানিক ৩০ সেন্টিমিটার সরাতে হবে, তারপর ডান পা সংযুক্ত হবে। এইভাবে আবার আর একবার করলে নির্দেশ পূর্ণ করা হবে। ডাইনে যেতে গেলে আগে ডান পা ডান দিকে যাবে, তারপর বাঁ পা তার সঙ্গে যুক্ত হবে।

এর পরেই যদি নির্দেশ হয়—'ডাইনে (অথবা বাঁয়ে) ঘোর', তবে মার্চ করতে করতে ৯০ ডিগ্রি ডাইনে অথবা বাঁয়ে ঘুরতে হবে।

যোগব্যায়াম/আসন

শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে যোগব্যায়ামের চাইতে ভাল ব্যায়াম আর নেই। প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের আদর্শ অনুসরণ করে আজও তাই অনেকে নিয়মিত যোগব্যায়াম করে। পাশ্চাত্যের বহু দেশেও আজকাল যোগব্যায়ামের মাধ্যমে রোগ নিবারণ হচ্ছে। এর নিয়মিত অভ্যাসে শুধু যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়, তা নয়—যোগব্যায়াম কর্মক্ষমতা বাড়ায়, কাজে ইচ্ছা যোগায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে যোগব্যায়াম রোগপ্রতিরোধও করে।

তবে কারো দেহে গুরুতর আঘাত বা শরীরের কোনও অংশ দুর্বল থাকলে যোগব্যায়াম করা উচিত নয়। শরীর দুর্বল থাকলে সহজ ব্যায়ামগুলি করা যায়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার—

যেহেতু পেশীগুলি সকালের চাইতে সন্ধ্যার দিকে নমনীয় থাকে, তাই সন্ধ্যাই আসনের উপযুক্ত সময়। পেশীর জন্য কঠিন ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়াম একই দিনে করলে ক্ষতি হয় না। তবে উভয় ব্যায়ামের মাঝে অন্ততঃ কুড়ি মিনিট বিরতি রাখা উচিত। আর এই ব্যায়ামের জন্যে খোলামেলা জায়গা প্রয়োজন।

একই সঙ্গে কম বয়সের ছেলেমেয়েদের যোগব্যায়ামের পাঠ দিতে গেলে প্রতিটি অবস্থা (পজিশন) এক, দুই, তিন সংখ্যানুযায়ী নির্দেশ দিলে তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ হয়। তারা ইচ্ছা করলে একাদিক্রমে বিভিন্ন ব্যায়াম করতে পারে।

পাঠক্রমে ছাত্রদের যোগব্যায়ামের জন্য নির্দিষ্ট পাঠসূচী দেওয়া হয়নি। তবে ছাত্রীরা কোন্ কোন্ যোগব্যায়াম করবে বলা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য উৎকটাসন ও চক্রাসন, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য ধনুরাসন ও সর্বাঙ্গাসন এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য ভুজঙ্গাসন ও ধনুরাসনের কথা বলা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞগণ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য নিম্ন-বর্ণিত যোগব্যায়ামের পরামর্শ দিয়েছেন :

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী : ভুজঙ্গাসন, অর্ধসলভাসন, ধনুরাসন, হলাসন, পশ্চিমাতানাসন, চক্রাসন, বক্রাসন ও যোগমুদ্রা।

অষ্টম শ্রেণী : বৃক্ষাসন, সলাভাসন, তোলাঙ্গুনাসন, অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন, বকাসন, কুক্কুটাসন ও বজ্রাসন।

এখানে ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলি করার প্রণালী বর্ণিত হল :

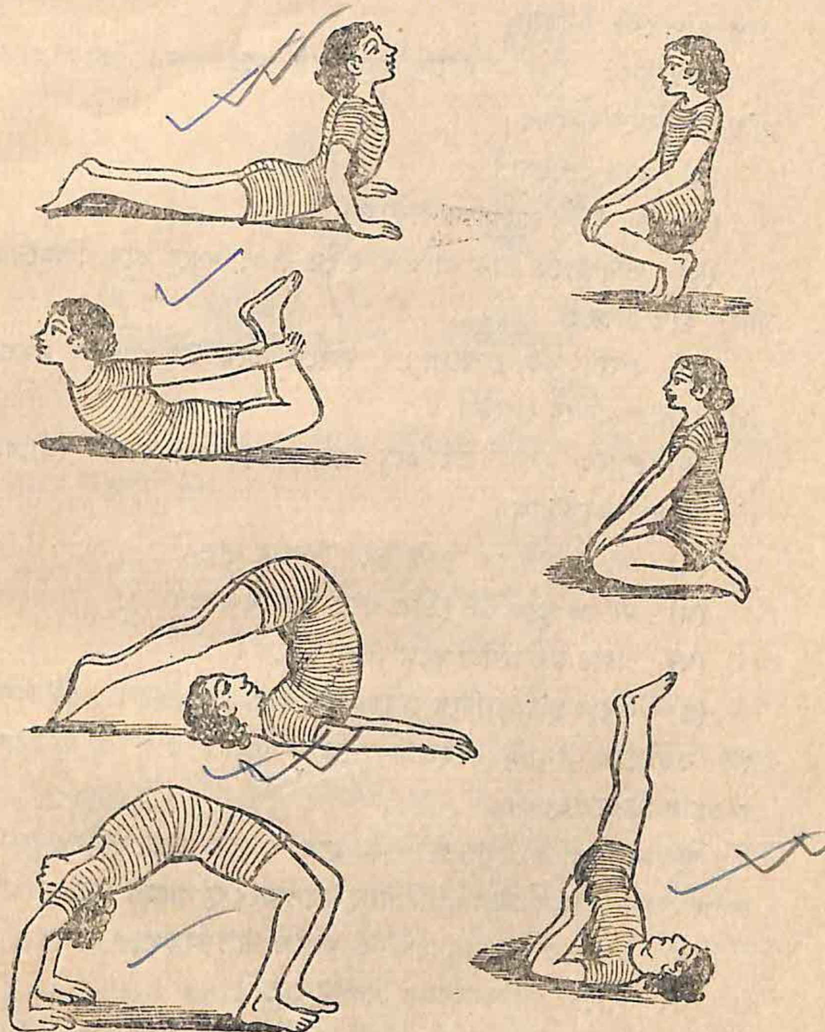
উৎকটাসন : (ক) সোজা হয়ে দাঁড়াও।

(খ) হাঁটু বাঁকিয়ে গোড়ালি তুলে পায়ের পাতার অগ্রভাগের উপর ভারসাম্য রাখতে হবে।

(গ) হাত থাকবে হাঁটুর উপরে এবং মেরুদণ্ড সোজা করে সম্মুখে তাকাতে হবে।

(ঘ) এবার 'খ' অবস্থায় ফিরতে হবে, তারপরে 'ক' অবস্থায়।

চক্রাসন : (ক) সোজা হয়ে দাঁড়াও।



বাঁদিকে উপর থেকে নিচে :—ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, হলাসন, চক্রাসন।
ডানদিকে উপর থেকে নিচে :—উৎকটাসন, বজ্রাসন, সর্বাঙ্গাসন।

(খ) যে কোনও একদিকে বেঁকে সেইদিকের হাঁটু স্পর্শ কর। অন্যদিকেও অনুরূপ কর। পুনরায় কর।

আর এক ধরনের চক্রাসন (উপরে ছবিতে এটি দেখানো

হয়েছে) হল বেঁকে পিছনে যাওয়া। তখন দেহের ভারসাম্য থাকে হাত ও পায়ের উপর।

ধনুরাসন : (ক) মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। তবে হাত দু'খানি থাকবে দু'ধারে।

(খ) হাত তোলো।

(গ) পা হাঁটুর সংযোগে বাঁকাও।

(ঘ) ডান হাতে ডান পা ও বাঁ হাতে বাঁ পা ধরতে হবে পিছনের দিকে হাত নিয়ে।

(ঙ) এবার বুক তোলো। তুলতে হবে উরুও, এবং সমস্ত দেহের ভার থাকবে পেটে।

সর্বাঙ্গাসন : (ক) চিৎ হয়ে শুয়ে পড় এবং হাত শরীরের দু'ধারে লম্বা করে রাখ।

(খ) পা দু'খানি ৩০ ডিগ্রি তুলে বিশ্রাম নাও।

(গ) আরও তুলে ৬০ ডিগ্রি করে বিশ্রাম নাও।

(ঘ) এবার ৯০ ডিগ্রি তুলে বিশ্রাম নাও।

(ঙ) এবার দু'হাত দিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা কর। এই সময় দুই কনুইয়ের উপরই দেহভার পড়ে। এবারে ৫ পর্যন্ত গুনে 'ক' অবস্থায় ফিরতে হবে।

ভুজঙ্গাসন : (ক) উপুড় হয়ে শুতে হবে। হাতের চেটো মাটিতে বুকের পাশে রেখে বিশ্রাম নেবে। বিশ্রাম দিতে হবে দু'পায়ের পাতাকেও।

(খ) হাতে ভারসাম্য রেখে বুক আস্তে আস্তে তুলতে হবে।

(গ) পায়ের পাতা তখনও বিশ্রাম নেবে।

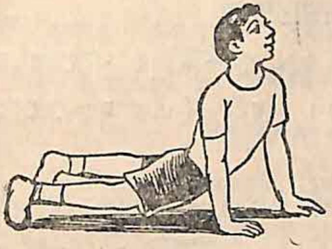
(ঘ) এবার ধীরে ধীরে মাথা পিছনের দিকে নিয়ে যাও, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যেন যায়।

(ঙ) এবার পেট তোলো। হাতের উপর ভারসাম্য থাকায় কনুই কিছুটা বেঁকবে।

সবশেষে পাঁচ পর্যন্ত গুনে শুরুর অবস্থায় ফিরতে হবে।

স্বদেশী ব্যায়াম

স্বদেশী ব্যায়ামে ডন, বৈঠক ও সূর্য-নমস্কারের কথা বলা হয়েছে।



ডন



বৈঠক

হাল্‌কা সরঞ্জামের ব্যায়ামে লেজিম, ডাম্বেল ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জিমন্যাস্টিকস্

আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশন ছেলে ও মেয়েদের জন্য জিমন্যাস্টিকস্‌কে ছ'ভাগে ভাগ করেছেন। ছেলেদের জন্য তাঁরা ১২টি ও মেয়েদের জন্য ৮টি ব্যায়াম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

ছেলেদের প্রতিযোগিতা ঃ হরাইজন্টাল ফিক্সড্ বার, প্যারালেল বার, রিং, পমেল্ড হর্স, লং হর্স (ভল্ট) ও ফ্রী-স্ট্যাণ্ডিং এক্সারসাইজ। এগুলির প্রত্যেকটিতে আবার একটি আবশ্যিক ব্যায়াম ও একটি ঐচ্ছিক ব্যায়াম রয়েছে।

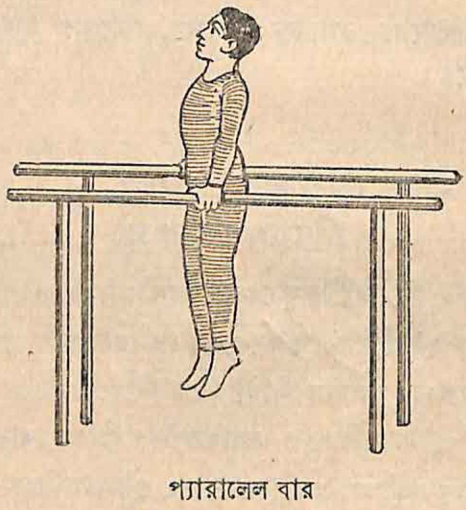
মেয়েদের প্রতিযোগিতা ঃ বিভিন্ন উচ্চতার প্যারালেল বার, বিম ব্যালান্স এবং বিট বোর্ড সহ আন-পমেল্ড লং হর্স। ছেলেদের মত মেয়েদেরও প্রত্যেক ইভেণ্টে একটি আবশ্যিক ও একটি ঐচ্ছিক ব্যায়াম থাকে।

প্রতি দলে ঃ জিমন্যাস্টিকসের প্রতিটি দল গঠিত হয় ৬ জন ছেলে অথবা ৬ জন মেয়ে নিয়ে এবং এদের প্রত্যেকেরই (ছেলে বা মেয়ে) প্রতিটি ব্যায়ামে পারদর্শী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় এই নিয়ম। কিন্তু দলগত প্রতিযোগিতায় ৫ জনের দল অংশ নিতে পারে।

ছেলেদের সরঞ্জাম

ফিক্সড্ বার ঃ মসৃণ স্টিলের ২.৮ সেন্টিমিটার ব্যাসের হবে। মাটি থেকে উচ্চতা ২.৫০ মিটার। দৈর্ঘ্য—(এক দণ্ড থেকে আর এক দণ্ড পর্যন্ত) ২.৪০ মিটার।

প্যারালেল বার ঃ কাঠের তৈরি বারের খাড়াগুলির ব্যাস ৫.১ সেন্টিমিটার ও সমান্তরালগুলির ব্যাস ৪.১ সেন্টিমিটার। মাটি থেকে



প্যারালেল বার

উচ্চতা ১.৭০ মিটার। দৈর্ঘ্য ৩.৫০ মিটার। দুই সমান্তরাল বারের দূরত্ব ৪২.৪৮ সেন্টিমিটার।

হর্স ঃ দৈর্ঘ্য ১.৬০ মিটার, প্রস্থ ৮০ সেন্টিমিটার।

পমেল্ড হর্স ঃ হর্সের পিছন দিকটা মাটি থেকে ১.১০ মিটার উঁচু এবং পমেল্ডের উচ্চতা হর্সের পিছন থেকে ১২ সেন্টিমিটার।

লং হর্স ঃ হর্সের পিছন দিকটা মাটি থেকে ১.৩৫ মিটার উঁচু।

রিং : রিং-এর ফ্রেম মাটি থেকে ৫.৫০ মিটার উঁচু হয়। রিং-এর ব্যাস ১৮ সেন্টিমিটার। দুই দড়ির ব্যবধান ৫০ সেন্টিমিটার।

ফ্লোর : দাঁড়িয়ে খালি-হাতের ব্যায়ামগুলির জন্য সমান মেঝে বা মাঠ চাই ১৪×১৪ মিটার মাপের। মেঝে বা মাঠ অবশ্যই কার্পেট বা নরম গদী দিয়ে মোড়া থাকবে। গদীর উচ্চতা ৫.১০ সেন্টিমিটার।

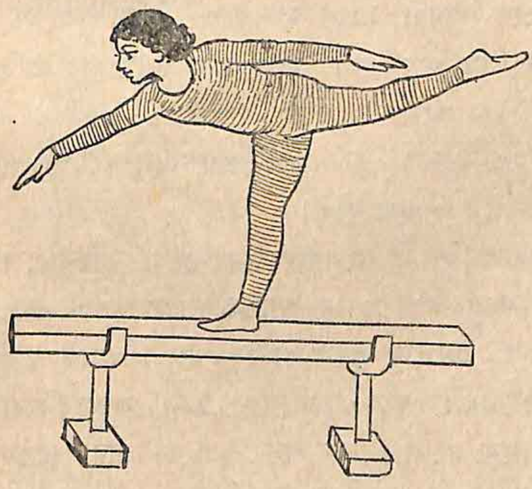
বিট বোর্ড : দৈর্ঘ্য ১২০ সেন্টিমিটার, সামনের দিকের উচ্চতা ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ৬০ সেন্টিমিটার।

মেয়েদের সরঞ্জাম

বার : সবচেয়ে উঁচু ২৩০ সেন্টিমিটার।
সবচেয়ে নিচু ১৫০ সেন্টিমিটার।
লম্বা ৩০০ সেন্টিমিটার।
ডিম্বাকৃতি বার ৪১×৫১ সেন্টিমিটার।

দুই বারের দূরত্ব ৪৩ থেকে ৪৮ সেন্টিমিটার।

বিম : উপরের দিকের উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার। দৈর্ঘ্য ৫০০ সেন্টিমিটার।



বিম ব্যালান্স

বিট বোর্ড : ১০ সেন্টিমিটার উচ্চতার শক্ত বিট বোর্ড দরকার।

লং হর্স ঃ লম্বা ১৬০ সেন্টিমিটার, উচ্চতা ১১৮ সেন্টিমিটার ও চওড়া ৩৫ সেন্টিমিটার।

লং হর্সের বিট বোর্ডের দৈর্ঘ্য ১২০ সেন্টিমিটার, উচ্চতা ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ৬৪ সেন্টিমিটার হবে।

ফ্লোর ঃ দাঁড়িয়ে খালি-হাতের ব্যায়ামের জন্য ১৪ X ১৪ মিটার আয়তনের মাঠে বা মেঝেতে কার্পেট অথবা গদীর আবরণ দিতে হবে।

সরঞ্জাম ব্যতীত জিমন্যাষ্টিকসে ফ্রগ লীপ, নভেল্টি ওয়াক, ব্যালান্স বেণ্ড, নী ডিপ, এরো ড্রাইভ, লং আর্ম হ্যাং, কর্ক স্ক্রু, হর্স হপ্-এর ট্রেনিং বা পাঠ দেওয়া যেতে পারে।

(বই প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্যতের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী পাওয়া যায়নি।)

অ্যাথ্লেটিকস্

প্রাচীনকালে ওলিম্পিক ক্রীড়ার শুরু থেকে ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেণ্ট বা দৌড়, লাফ ও ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয়। ৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অথবা ২২শে জুলাই ওই ওলিম্পিক হয়। তখন দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছিল। কিন্তু লাফ ও ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫৬ অব্দে। সেবার স্পার্টার চিওনিস লং-জাম্প দিয়েছিলেন ২৩ ফুট ১½ ইঞ্চি এবং প্রোটেসিলাস ডিসকাস ছোঁড়েন ১০০ কিউবিট বা ১০০ হাত দূরে।

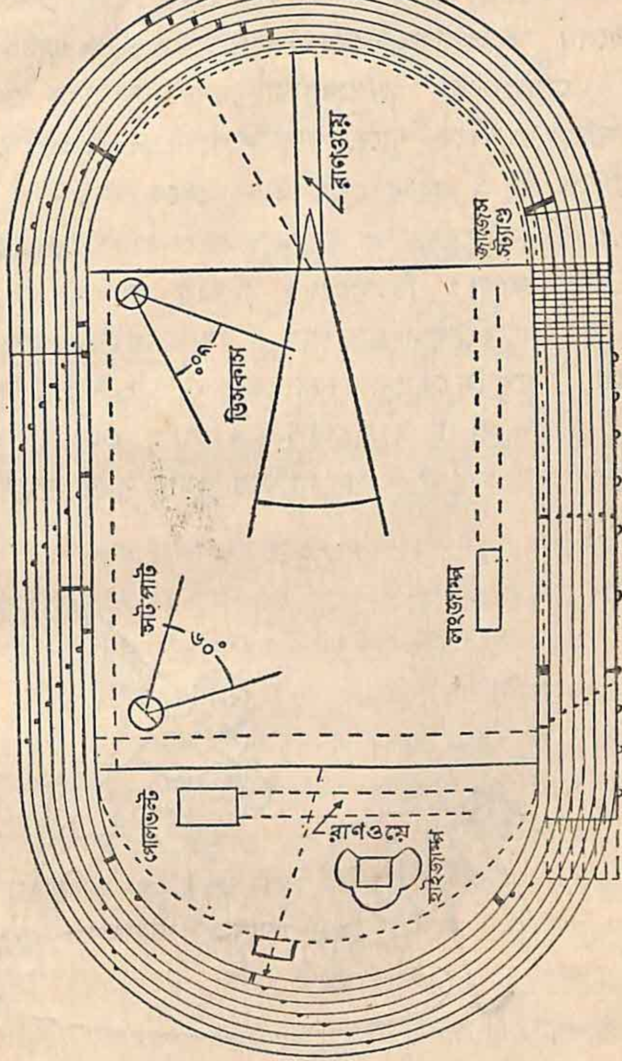
অ্যাথ্লেটিকস্ মানেই অপেশাদারদের ব্যাপার। অর্থাৎ, যারা এতে অংশ নেয় তারা এর জন্য কোনো আর্থিক পুরস্কার গ্রহণ করে না।

পোশাক ঃ প্রত্যেক অ্যাথ্লীটকে খাটো প্যাণ্ট এবং অন্ততঃ গেঞ্জী পরতেই হয়। তবে সে খালি-পায়ে বা কেডস্ কিংবা স্পাইক (কাঁটা) লাগানো জুতো পরে নামবে কিনা তা তার পছন্দের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রতিযোগী গেঞ্জী বা জামায় উদ্যোক্তাদের দেওয়া নম্বর সেঁটে নেয়।

দৌড় ঃ দৌড়ের প্রতিযোগীরা কখনও নিজের পথ ছেড়ে অন্যকে বাধা দিতে পারে না। যে এই কাজ করে তার পয়েন্ট কাটা যায়।

অ্যাথ্‌লেটিকসের ৪০০ মিটার ট্র্যাক

১ ইঞ্চি = ২০ মিটার



৪০০ মিটার দৌড়ের ট্র্যাক। ভিতরে ডিসকাস, সটপাট, লং-জাম্প, হাই জাম্প, পোলভল্ট-এর আরম্ভ-স্থান। উপরের রাণওয়েটি জ্যাভেলিনের।

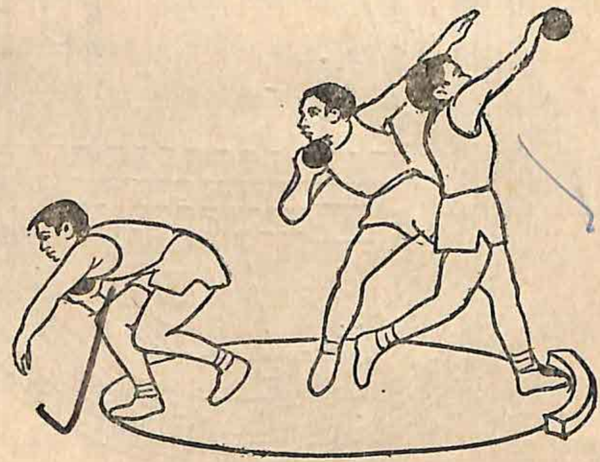
আধুনিক নিয়মে প্রত্যেকটিরই আরম্ভ-স্থান ৪৫ ডিগ্রি।

হাই জাম্প ঃ হাই জাম্পের জন্য উপরে যে ক্রসবার ও দুই ধারে পোস্ট থাকে তা প্রতিযোগিতা চলাকালে সরানো যায় না। বিচারকমণ্ডলী এইগুলি সরাতে পারেন তাদের একটি রাউণ্ড শেষ হলে। তাঁরাই স্থির করেন ক্রসবারটি কত উঁচু করতে হবে।

পোলভল্ট ঃ প্রতিযোগীরা যে কোনো দিক থেকে ক্রসবার অতিক্রম করতে পারে, তবে স্টপবোর্ডের ভিতর দিকে ৬১ সেন্টি-মিটার বা ২ ফুটের বেশি উচ্চতা থেকে যেন দৌড় শুরু না হয়। পোলটি যেন বাঁশের, অ্যালুমিনিয়ামের বা ফাইবার গ্লাসের হয়।

লং-জাম্প ঃ বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লং-জাম্পে তিন থেকে ছয়বার ট্রায়াল হতে পারে। 'স্ক্র্যাচ-লাইন' থেকে লাফ দিতে হয়। তবে যে কোনো জায়গা থেকে দৌড় শুরু করা যায়।

ট্রিপল্ জাম্প (হপ, স্টেপ ও জাম্প) ঃ যে পায়ে ভর করে লাফ দেওয়া হয়, সেই পা-ই যেন লাফিয়ে পড়ার সময় আগে মাটি স্পর্শ করে।



সটপাটের বিভিন্ন মুহূর্ত

সটপাট ঃ সট ছুঁড়তে হবে কাঁধ থেকে এক হাত দিয়ে। সটটি কাঁধের পিছন থেকে আনা নিষেধ।

ডিসকাস এবং হ্যামারও ছুঁড়তে হয় সটপাটের মত স্টপবোর্ডের উপর থেকে। একই নিয়মে।



ডিসকাস



জ্যাভেলিন ছোঁড়ার মুহূর্ত

জ্যাভেলিন : জ্যাভেলিন ছোঁড়ার (এক হাতে) ঠিক আগে রাণওয়ে বা দৌড়পথ যেন ৩৬.৫ মিটারের বেশি না হয় এবং ৩০ মিটারের কম না হয়। চিহ্নিত নির্দিষ্ট স্থান থেকে জ্যাভেলিন ছুঁড়তে হবে এবং মাটিতে পড়ার আগে স্থান ত্যাগ করা চলবে না।

দলগত দৌড় : কারও আঘাত বা অসুস্থতার কারণেই কেবল দলগত দৌড়ে বদলী চলে। তা না হলে হিটে যারা অংশ নেয় তাদেরই নিয়মিত দলগত দৌড়ের পরবর্তী পর্যায়ে অংশ নিতে হয়।

ম্যারাথন দৌড় : ম্যারাথনের দূরত্ব ৪২.২৫ কিলোমিটার বা ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। রোড রেস বা ম্যারাথন রেস রাস্তাতেই হয়ে থাকে। তবে প্রতিযোগীদের ট্রাফিক রুল বা পথ চলার নিয়ম মানতে হয়। যদি গাড়ি চলাচলের জন্যে বা অন্য কারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, তবে ফুটপাথ ব্যবহার করা যেতে পারে। ম্যারাথন দৌড় শুরু ও শেষ হয় ঘেরা মাঠে।

রিলে রেস : রিলে দৌড়ে বিভিন্ন দূরত্বে চক বা চুন দিয়ে স্ক্যাচ-লাইন নির্দিষ্ট থাকে। শুরুতে বিভিন্ন দলের পৃথক পৃথক চিহ্ন দেওয়া হয়। দৌড়বার সময় অবশ্যই ব্যাটন হাতে রাখতে হবে। ব্যাটন পড়ে গেলে যার হাত থেকে পড়েছে, সে-ই তা তুলে নেবে। 'টেক-ওভার জোন'-এ ব্যাটন বদল করতে হয়।

ওয়াকিং রেস বা হাঁটা ঃ হাঁটা প্রতিযোগিতায় লক্ষ্য রাখা হয় এক পা মাটিতে পড়ার আগে আর এক পা উঠে আসছে কিনা। তা না হলে বিচারক সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগীকে বাতিল করতে পারেন।

হার্ডল রেস ঃ বিভিন্ন দূরত্বের হার্ডল দৌড়ে বিভিন্ন উচ্চতা থাকে। হার্ডল চওড়া হবে ১.১৯ মিটার বা ৩ ফুট ১১ ইঞ্চি। প্রত্যেক দৌড়ে ১০টি হার্ডল অতিক্রম করতে হয়।

কত মিটার দৌড়	হার্ডলের উচ্চতা	স্ক্র্যাচ-লাইন থেকে প্রথম হার্ডল	মাঝের হার্ডল-গুলি	শেষ হার্ডল থেকে সমাপ্তি রেখায়
১১০	১০৬.৭ সে.মি.	১৩.৭২ মিটার	৯.১৪ মিটার	১০.০২ মিটার
২০০	৭৬.২ ঐ	১৮.২৯ ঐ	১৮.২৯ ঐ	১৭.১০ মিটার
৪০০	৯১.৪ ঐ	৪৫ ঐ	৩৫ ঐ	৪০ মিটার

প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজস্ব পথে দৌড়বে। ইচ্ছাকৃতভাবে হার্ডল ফেললে বা অপরের হার্ডল অতিক্রম করলে দণ্ড পেতে হবে।

স্টিপলচেজ ঃ (ক) ৩,০০০ মিটার দৌড়, ২৮টি হার্ডল ও ৭ বার জলে লাফ। (খ) ২,০০০ মিটার দৌড়, ১৭টি হার্ডল ও ৪ বার জলে লাফ। (গ) ১,০০০ মিটার দৌড়, ৮টি হার্ডল ও ২ বার জলে লাফ।

ডেকাথলন ঃ ডেকাথলনে ১০টি ইভেন্ট থাকে। এগুলি হল ঃ ১০০ মিটার দৌড়, লং-জাম্প, সটপাট, হাই জাম্প, ৪০০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হার্ডল, ডিসকাস, পোলভল্ট, জ্যাভেলিন ও ১,৫০০ মিটার দৌড়।

পেন্টাথলন ঃ এটি কেবল মেয়েদের জন্যই। পেন্টাথলনে ৫টি

ইভেন্ট থাকে। যথা: লং-জাম্প, জ্যাভেলিন, ২০০ মিটার দৌড়, ডিসকাস ও ১৫০০ মিটার দৌড়।

টাগ-অব-ওয়ার বা দড়ি টানা: প্রতি দলে ৮ জনের বেশি সদস্য থাকবে না। তিন বারের দড়ি টানে যারা ২ বার জেতে, তাদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। দড়ি ১০.১৬ থেকে ১২.৭০ সে.মি. বা ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি মোটা হবে। ৩২ মিটার বা ৩৫ গজ লম্বা দড়ির কোথাও যেন গিঁট না থাকে। প্রত্যেকেই দু'হাতে দড়ি ধরে, কিন্তু শেষ ব্যক্তি বা 'অ্যাংকরম্যান' কাঁধেও দড়ি আটকে নিতে পারে।

অ্যাথ্‌লেটিকসের জন্য বহু কর্মকর্তা প্রয়োজন। যথা: একজন রেফারী, একাধিক বিচারক। একজন টাইমকীপার এবং তার দু'জন সহকারী, একজন ক্লার্ক, একজন স্টার্টার, এক বা একাধিক মার্কসম্যান, একাধিক অ্যানাউন্সার, একাধিক আম্পায়ার, প্রতিযোগী-দের স্টুয়ার্ড, বিচারকদের স্টুয়ার্ড প্রভৃতি।

সাঁতার

আন্তঃস্কুল সাঁতার প্রতিযোগিতার প্রবর্তক জাপান। সম্রাট গোয়ুজি ১৬০৩ সালের শুরুতে ওই প্রতিযোগিতার নির্দেশ দেন। বড় আকারের প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার শুরু হয় লণ্ডনে, ১৮৩৭ সালে। তখন ওখানে পাঁচটিরও বেশি আধুনিক সাঁতার-পুল ছিল।

পৃথিবীর বৃহত্তম সাঁতার-পুল মরোক্কোর কাসাব্লাঙ্কায়। নাম ওরথ-লিয়ের পুল। এর দৈর্ঘ্য ৪৮০ মিটার (১,৫৭৪.৮ ফুট) ও প্রস্থ ৭৫ মিটার (২৪৬ ফুট)। মোট আয়তন ৮.৯ একর। তবে সাঁতার প্রতিযোগিতার জন্যে নির্দিষ্ট বৃহত্তম সাঁতার-পুল রয়েছে জাপানের ওসাকা শহরে। সেখানে ২৫ হাজার দর্শক বসবার ব্যবস্থা আছে। স্বল্প-সাঁতারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কোনও স্থান না থাকলেও দূরপাল্লার সাঁতারে আমাদের স্থান সবার উপরে। ইংলিশ চ্যানেল

সাঁতারু শ্রীমিহির সেন ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই এপ্রিল পক-প্রণালী (ভারত থেকে সিংহল) অতিক্রম করেন ২৪ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটে ; ২৪শে আগস্ট জিব্রাল্টার-প্রণালী (ইউরোপ থেকে আফ্রিকা) পার হন ৮ ঘণ্টা ১ মিনিটে ; ১২ই সেপ্টেম্বর দার্দানেলিস (ইউরোপের গালিপোলি থেকে এশিয়া মাইনরের সেতুলবাহির) অতিক্রম করেন ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে। ২৯-৩১শে অক্টোবর সমগ্র পানামা খাল পার হন ৩৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে। শ্রীসেন ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন ১৯৫৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে।

সাঁতার সাধারণতঃ চারভাগে বিভক্ত। যথা : ফ্রী-স্টাইল, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারফ্লাই স্ট্রোক ও ব্যাক স্ট্রোক।

ফ্রী-স্টাইল : ফ্রী-স্টাইলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহের পিছন দিকটা জলের উপরে থাকে, অর্থাৎ সাঁতারু যখন মাথার আগে একের পর এক দু'হাত বাড়িয়ে জল টানতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে দম নেওয়ার সময় সাঁতারুর মুখ দেখা যায়। দেখা যায় তার পিঠ এবং গোড়ালি ও পায়ের পাতা। হাত দিয়ে জল টেনে ও পা দিয়ে জল কেটে সে সাবলীলভাবে এগিয়ে চলে।

ব্রেস্ট স্ট্রোক : ব্রেস্ট স্ট্রোকে জলের উপরে সাঁতার দেওয়া যায় না। দু'টি হাত একই সঙ্গে বুকের কাছ থেকে জলের মধ্যে ঠেলতে হবে সামনের দিকে এবং জল টেনে দু'টি হাতে পিছনের দিকে নিতে হবে। সমস্ত শরীরটার ভারসাম্য থাকে বুকের উপর ; জলের উপর থাকে শুধু দু'টি কাঁধ। তবে খাড়াখাড়িভাবে ওঠানো-নামানো নিষেধ। টার্ণ নেওয়ার সময় বা সমাপ্তি রেখায় পৌঁছলে দুই হাত স্পর্শ করতে হয়।

বাটারফ্লাই স্ট্রোক : দু'টি হাত একসঙ্গে জলের উপরে সামনের দিকে নিয়ে আবার একই সঙ্গে একইভাবে পিছনে আনতে হয় জল টেনে। এতে সমস্ত শরীরের ভারসাম্য থাকে বুকের উপর। কাঁধ থাকে জলের উপর ভাসমান। তবে বাটারফ্লাইয়ে পা খাড়াভাবে উঁচু-নিচু

করা যায়। সমাপ্তি রেখা বা টার্ণ নিতে দুই হাত স্পর্শ করতে পারে।

ব্যাক স্ট্রোক ঃ প্রত্যেক প্রতিযোগী সাঁতারু আরম্ভ-রেখা বা স্টার্টিং এণ্ড-এর দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। সারাক্ষণ পিছনে সাঁতার কাটতে হয়।

ফ্রী-স্টাইল বিভিন্ন দূরত্বে ঃ ফ্রী-স্টাইল প্রতিযোগিতা হয় ১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০ ও ১৫০০ মিটারে, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারফ্লাই ও ব্যাক স্ট্রোক ১০০ ও ২০০ মিটারে।

৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি সাঁতার কাটতে হয় এইভাবে ঃ ১০০ মিটার বাটারফ্লাই, ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক, ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক ও ১০০ মিটার ফ্রী-স্টাইল। মেডলি রিলে হয় ঃ ৪০০ × ১০০ = ব্যাক স্ট্রোক, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারফ্লাই স্ট্রোক ও ফ্রী-স্টাইল।

পুল ঃ পুলের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার বা ৫৫ গজ হওয়া প্রয়োজন। ব্যাক স্ট্রোক ছাড়া অন্য সব প্রতিযোগিতা ডাইভ দিয়ে শুরু করতে হয়।

পরিচালকবর্গ ঃ সাঁতার প্রতিযোগিতায় একজন রেফারী, একজন স্টার্টার ও মাথা-পিছু একজন সময়রক্ষক, বিচারকমণ্ডলী ও টার্ণ পরিদর্শক প্রয়োজন।

ডাইভিং

ডাইভিং-এর আক্ষরিক অর্থ জলে ঝাঁপ। ওলিম্পিক বা জাতীয় সাঁতারের (অ্যাকোয়াটিকস্) অন্তর্ভুক্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গে ডাইভিং তেমন প্রসার লাভ করেনি। কারণ, ডাইভিং-এর জন্য যে প্ল্যাটফর্ম বা বোর্ড ব্যবহার করতে হয়, তা তৈরি করতে হাজার হাজার টাকার প্রয়োজন। অবশ্য কলকাতার কয়েকটি বড় সাঁতার ক্লাব—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং-পুলে প্রচুর অর্থব্যয়ে ডাইভিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু মফঃস্বল বাংলায় প্ল্যাটফর্ম না থাকায় ডাইভিং প্রসার লাভ করেনি।

ডাইভিং দু'রকমের। একটি স্প্রিং বোর্ড, অন্যটি হাইবোর্ড।

স্প্রিং বোর্ড ঃ এই ডাইভিং-এ বোর্ডগুলি প্ল্যাটফর্মের উপর জল থেকে ১ মিটার ও ৩ মিটার উঁচুতে থাকে। বোর্ডের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৪ মিটার ও প্রস্থ ½ মিটার হয়। পিচ্ছিল হওয়ার আশঙ্কামুক্ত করতে সমস্ত বোর্ডটি নারকেল দড়ির ম্যাটে মোড়ানো হয়। স্প্রিং বোর্ডের সম্মুখভাগ থেকে খাড়া জলে ঝাঁপ দিতে গেলে জলের অন্যূন গভীরতা কোথায় কেমন থাকবে তা এই রকম ঃ

	১ মিটার উঁচু বোর্ড	৩ মিটার উঁচু বোর্ড
গভীরতা	৩ মিটার	৩.৫ মিটার
সামনের দূরত্ব	৫.৩ মিটার	৬.২ মিটার
দু'দিকের দূরত্ব	২.২ মিটার	২.৭ মিটার

ছেলে ও মেয়েদের স্প্রিং বোর্ড প্রতিযোগিতায় পাঁচটি আবশ্যিক ডাইভ-এর সঙ্গে পাঁচটি ঐচ্ছিক ডাইভ দিতে হয়।

আবশ্যিক ডাইভ ঃ ফরওয়ার্ড, ব্যাক, রিভার্স, ইনওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড কিন্তু আধা পাক দেওয়া।

হাইবোর্ড ঃ হাইবোর্ডের প্ল্যাটফর্ম অত্যন্ত শক্ত থাকে। ২ মিটার চওড়া বোর্ড নারকেল দড়িতে মুড়তে হয়। ১০ মিটার উঁচু প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের কম যেন না হয় এবং ৫ মিটার উঁচু প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য ৫ মিটার হবে।

১০ মিটার প্ল্যাটফর্মটি ১.৫ মিটার বাইরে প্রসারিত থাকে। প্ল্যাটফর্মের পিছনে এবং দু' দিকে ঘেরা ও উপরে ওঠার জন্য সিঁড়ি অবশ্য প্রয়োজন।

হাইবোর্ডে প্ল্যাটফর্ম থেকে খাড়া নিচে জলের গভীরতা কোথায় কেমন ঃ

	৫ মিটার বোর্ড	১০ মিটার বোর্ড
গভীরতা	৩.৮ মিটার	৪.৫ মিটার
সামনের দূরত্ব	৭ মিটার	১০.৫ মিটার
দু'দিকের দূরত্ব	৩ মিটার	৩ মিটার

ছেলেদের হাইবোর্ড ডাইভিং-এ ৬টি আবশ্যিক ডাইভ সমেত যতগুলি ইচ্ছা ঐচ্ছিক ডাইভ দেওয়া যায়। তবে মেয়েদের জন্য হাইবোর্ড ডাইভে শুধু ফরওয়ার্ড, ব্যাক, রিভার্স ও ইন্‌ওয়ার্ড নির্দিষ্ট আছে।

হাইবোর্ড ডাইভিং দু'ভাবে দেওয়া যায়। যথা—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাফ ও দৌড়ে এসে লাফ। যেভাবেই শুরু হোক, প্ল্যাটফর্ম থেকে কেউ সোজা লাফ দেয়, কেউ বা পড়ে বর্শার মত, কেউ বা পড়ে শরীর গুটিয়ে নিয়ে।

ডাইভিং-এ একজন রেফারী, একাধিক জাজ, দু'জন সেক্রেটারি নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়।

কীভাবে কোন্ ডাইভ দিতে হয়ঃ দাঁড়ানো ডাইভে প্রতিযোগী বোর্ডের সম্মুখভাগে এসে মাথা সোজা করে, পা দু'টি একত্রে থাকে, আঙুলগুলি একত্র করে হাত দু'টি সোজা সামনে নিয়ে (কাঁধের উপরে যেন না ওঠে) দাঁড়ায়। দোলাবার আগে অবশ্য হাত নামানো হয়।

স্প্রিং বোর্ডের ফরওয়ার্ড ডাইভ দাঁড়িয়ে বা দৌড়ে এসে শুরু করা যায়। তবে অন্ততঃ চার পা দৌড়তে হয় এবং রাণিং ডাইভের লাফের আগে দু' পা একত্র করতে হয়। ফিক্সড্ বোর্ডে এক পা দিয়েও শুরু করা যায়। তবে দাঁড়ানো ডাইভে বোর্ডের উপরে বাউন্স বা ধাপানো চলে না। দৌড় ডাইভে বোর্ডের শেষপ্রান্তে যাওয়ার আগে দৌড় থামানও নিষেধ।

ব্যাক ডাইভে লাফাবার আগে বোর্ডের উপরে পা সামান্য তোলা যায়, কিন্তু তা যেন ধাপানো না হয়।

বোর্ড থেকে লাফানোর পর শূন্যে দেহ সোজা, বর্শার মত বা গোটানো অবস্থায় থাকতে পারে।

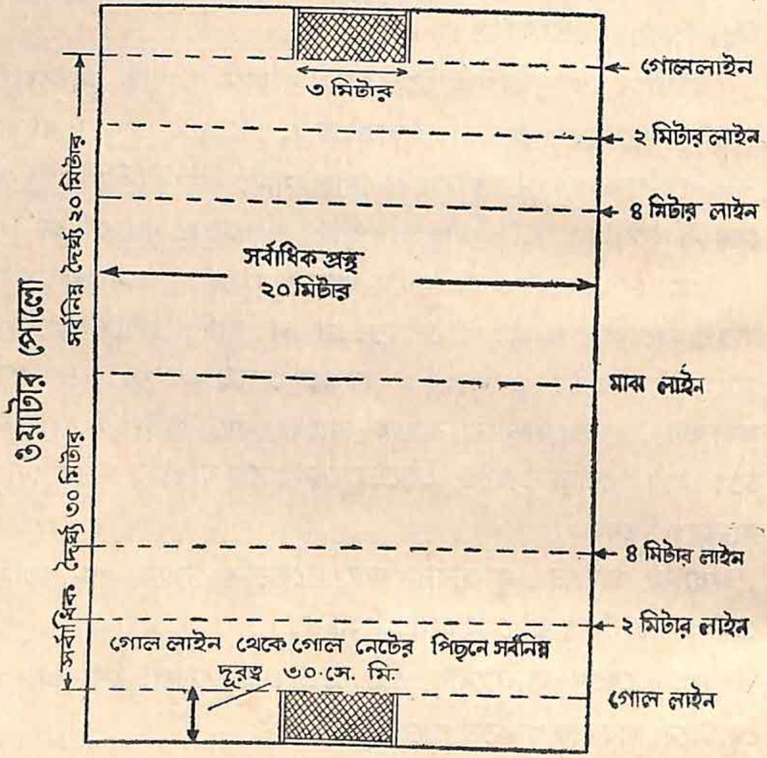
'সোজা' অর্থ শরীর যেন বেঁকে না যায়। হাঁটু বা কোমরের নিচের পিছন দিকটা যেন বেঁকে না যায়। বর্শার মত করতে গেলে কোমরের নিচের অংশ পিছন দিকে বেঁকবে, কিন্তু পা থাকবে সোজা। পায়ের

পাতা দেহের সঙ্গে সোজা করতে হবে। কুঁকড়ে বা শরীর গুটিয়ে গেলে হাঁটু দু'টো বুকের কাছে টেনে আনতে হয়, কিন্তু পায়ের পাতা ছুঁচালো রাখাই রীতি।

সব ডাইভেই খাড়া বা প্রায় ওই অবস্থায় জলে পড়তে হয়। তবে পায়ের ডগা কম্পাসের মত সোজা থাকবে।

ওয়াটার পোলো

ওয়াটার পোলোর জন্য ৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের ও ২০ মিটার প্রস্থের এবং অন্যূন ১ মিটার গভীর জলের স্রোতবিহীন পুকুর, ট্যাঙ্ক বা পুল



ওয়াটার পোলোর পুল

প্রয়োজন। তবে ২০ মিটার দৈর্ঘ্যের জলাশয়েও খেলা যেতে পারে। অর্থাৎ এক গোল থেকে আর এক গোলের দূরত্ব ৩০ থেকে ২০ মিটার

হবে। তবে মেয়েদের জন্য মাপ ২৫ × ১৭ মিটার। খেলার স্থানের সীমানা নির্ধারিত হয় গোল-লাইনের ৩০ মিটার দূর থেকে। এই জলাশয়কে আধাআধি ভাগ করা হয়। এটি 'ফিল্ড অব প্লে'।

গোল-লাইন থেকে ভিতরের দিকে ২ মিটার দূরে উভয় দিকে একটি করে লাইন টানা হয়, ৪ মিটার দূরে আরও একটি করে লাইন থাকে।

গোলের দুই পোস্টের ব্যবধান ৩ মিটার এবং ক্রসবার জল থেকে ১ মিটার উঁচুতে থাকে। গোলপোস্টকে সাদায়-কালোয় বা অন্য কোন উজ্জ্বল রং-এ রং করা হয়—খেলোয়াড়, রেফারী প্রমুখের দেখার সুবিধার জন্য।

চামড়ার বা রাবারের বলের পরিধি ৬৮ সেন্টিমিটার থেকে ৭১ সেন্টিমিটারের মধ্যে হবে। ওজন ৪০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম।

রেফারীর কাছে সাদা পতাকা (এর একদিক নীল) এবং গোল-জাজদের কাছে দিতে হয় লাল পতাকা।

ক্যাপ: ওয়াটার পোলো খেলোয়াড়দের পোশাক সম্পর্কে যথেষ্ট বিধি-নিষেধ আছে। দুই দলে ৭+৭=১৪ জন খেলোয়াড় থাকে। এদের মধ্যে গোলকীপার ছাড়া একটি দল মাথায় গাঢ় নীল এবং আর একটি দল সাদা ক্যাপ বা টুপি পরে। সাদা টুপির দলের গোলকীপার সাদা-লাল টুপি ও গাঢ় নীল টুপির দলের গোলকীপার নীল-লাল—এইরকম রং-এর টুপি পরে।

খেলোয়াড়দের নম্বর থাকবে এইরকম: গোলকীপার—১, লেফট্ ব্যাক—২, রাইট ব্যাক—৩, হাফ-ব্যাক—৪, লেফট্ ফরওয়ার্ড—৫, সেণ্টার ফরওয়ার্ড—৬, রাইট ফরওয়ার্ড—৭, বদলী হলে ৮, ৯, ১০ নম্বর আসবে।

খেলার শুরুতে: খেলার যে কোনও পর্বের শুরুতে সকল খেলোয়াড় নিজ নিজ গোল-লাইনে দাঁড়াবে, তবে দু'জনের বেশি গোল-পোস্টের মধ্যে থাকতে দেওয়া হয় না। রেফারী বাঁশি বাজিয়ে ফিল্ড

অব প্লে বা মাঝ মাঠে বল ছুঁড়লে খেলা শুরু হয়। খেলোয়াড়রা সাঁতার কেটে বল ছুঁড়তে থাকে। এতে পাশ দেওয়া বা ড্রিবলিং করা যায়। গোল হয়ে গেলে খেলোয়াড়রা নিজেদের দিকে যে কোনও স্থানে দাঁড়াতে পারে। ওই গোল দেওয়া যায় শরীরের যে কোনও অংশ দ্বারা। তবে খেলা শুরুর পর অন্ততঃ দু'জন খেলোয়াড়ের বল স্পর্শ করা দরকার।

গোল-থ্রো : বিপক্ষের কেউ বল ছুঁড়লে যদি গোল-লাইনের উপর দিয়ে সেই বল যায় তাহলে যাদের গোলের উপর দিয়ে বল গিয়েছে তারা গোল-থ্রো পায়।

কর্ণার থ্রো : ওই বল রক্ষকদলের কারও গায়ে লেগে (ফুট বলের মত) গোল-লাইনের উপর দিয়ে গেলে কর্ণার-থ্রো পাবে আক্রমণকারীরা। তখন রক্ষকদলের শুধু গোলরক্ষক ২ মিটার লাইনের মধ্যে থাকতে পারে।

ফ্রী-থ্রো : ফাউল বা মাঠের বাইরে বল গেলে ফ্রী-থ্রো হবে।

পেনাল্টি থ্রো : বিপক্ষ বল নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকলে রক্ষকদলের কেউ ৪-মিটার লাইনের মধ্যে যদি ফাউল করে তবে আক্রমণকারী দল পেনাল্টি-থ্রো পায়। ৪-মিটার লাইনের যে কোনও জায়গা থেকে পেনাল্টি-থ্রো করা যায়। তখন গোলে থাকে শুধু গোলকীপার।

খেলার সময় : ৫ মিনিট করে ৪টি ইনিংস, অর্থাৎ ২০ মিনিট খেলা হয়। প্রতি অর্ধের মধ্যে ২ মিনিট বিরতি থাকে, আর এই সময় উভয় দল দিক-পরিবর্তন করে। নির্দিষ্ট সময়ে মীমাংসা না হলে ৫ মিনিট পরে ৩ মিনিট করে দুই পর্যায়ে খেলা হবে। তখন বিরতি ১ মিনিট।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফুটবল

পাড়ায়, স্কুলে বা ক্লাবের হয়ে তোমরা যেমন ফুটবল খেল, তেমনই কলকাতার ময়দানে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং, এরিয়ান ইত্যাদি বিখ্যাত দলের খেলা নিশ্চয়ই দেখতে যাও। মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভারত-বিখ্যাত। বিদেশেও কোথাও কোথাও এই রকম দু'টি করে জনপ্রিয় ফুটবল দল আছে যারা চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং যাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে যায় স্টেডিয়ামে। ব্রাজিলে স্যানটোস ও বোটাফোসা, রাশিয়ায় মস্কো ডায়নামো ও কিয়েভ ডায়নামো, স্পেনে বারসিলোনা ও রিয়্যাল মাদ্রিদ, ইংল্যাণ্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহাম হটস্পার, ইটালীতে জুভেনটাস ও ইণ্টার-ন্যাশন্যাল মিলান আর স্কটল্যাণ্ডে রেঞ্জার্স ও কেল্টিক চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। এইসব দল জনপ্রিয় ফুটবল খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে। ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইন্যালে দর্শক-সংখ্যা ছিল প্রায় দু'লক্ষ (১,৯৯,৮৫৪)। এই সংখ্যা থেকেই ফুটবলের জনপ্রিয়তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ফুটবলের জনপ্রিয়তা আর একদিক থেকেও বুঝতে পারা যায়। কয়েকজন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়ের নাম সারা বিশ্বে পরিচিত। পেলে, ইয়াসিন, পুস্কাস, নেটো, গ্যারিন্চা, ইউসেবিও, ভাবা, স্ট্যানলী ম্যাথুজ, চার্লটন, সুয়ারেজ, অনাসতাসি প্রমুখ খেলোয়াড়ের নাম শোনেনি এমন ব্যক্তি খুব কমই আছে। আবার এঁদের মধ্যে পেলের মত খ্যাতি ও অর্থ কেউই পাননি। ইনি প্রথম শ্রেণীর খেলায় এক হাজারেরও বেশি গোল করেছেন মাত্র ১৩ বছরে—যেটা কল্পনা করাই দুঃসাধ্য। পেলে বর্তমানে শারীর-শিক্ষার অধ্যাপক।

এমন জনপ্রিয় খেলার ইতিহাস নিয়ে কিন্তু সকলে একমত হতে পারেননি। তবে এ-কথা ঠিক যে, ফুটবল খেলা অনেক যুগ ধরে চলে আসছে। কারও কারও মতে ফুটবল খেলার জন্মস্থান চীন, আবার এমন মতও কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন যে, সম্রাট অশোকের আমলে ভারতেই প্রথম ফুটবল খেলা হয়। ফুটবলের জন্মকথা নিয়ে আর একটি মত আছে, সেটি বেশ মজার। বলা হয়, প্রাচীনকালে রোমানরা যুদ্ধে জিতে পরাজিত শত্রুর মাথার খুলিতে লাথি মেরে জয়ধ্বনি করত; ক্রমশঃ এর থেকেই ফুটবল খেলার উৎপত্তি হয়েছে। ২১৭ সালে ইংল্যাণ্ডে ডার্বিশায়ার ও চেস্টারের মধ্যে ফুটবল খেলা হয়েছিল। সেই খেলায় দু'দলেই শত শত খেলোয়াড় খেলেছিল এবং খেলাটি চলেছিল কয়েকদিন ধরে। এমন কি, ১৫৩০ সালে ইটালীতে একটি ফুটবল খেলা হয়েছিল, তাতে প্রতি দলে ২৬ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিল। ১৮০০ সালে সর্বপ্রথম ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়দের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ১৮৬৩ সালের ২৬শে অক্টোবর ইংল্যাণ্ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা 'এফ. এ.' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'এফ. এ.'-ই সর্বপ্রথম প্রচলিত আইনগুলি একত্রিত ও সংশোধিত করে ফুটবলের নিয়মাবলী রচনা করেন। বর্তমানে ফুটবল খেলা যে আইন অনুসারে হয়ে থাকে তা রচনা করেছেন ইণ্টারন্যাশন্যাল রেফারীজ অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের রেফারীজ কমিটি। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা হয় ১৮০২ সালে বোম্বাইয়ে দু'দল ইংরাজ সৈনিকের মধ্যে। ১৮৮০ সালে কলকাতায় সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা হয়।

ফুটবল খেলার আইন খেলার সঙ্গে জড়িত সকলের—অর্থাৎ খেলোয়াড়, রেফারী এবং দর্শক—সকলেরই জানা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক সময় আইন না জেনে অনেক খেলোয়াড় রেফারীর সঙ্গে অযথা তর্ক করে বা দর্শকরা ক্রুদ্ধ হয়ে খেলা পণ্ড

করে দেয়। এই জন্যে ফুটবল খেলতে, খেলাতে ও খেলা দেখতে গেলে ফুটবলের আইন-কানুন জানা প্রয়োজন।

ফুটবল খেলা হয় দু'টি দলের মধ্যে। কোনো দলে ১১ জনের বেশি খেলোয়াড় থাকতে পারবে না এবং এই ১১ জনের মধ্যে একজন গোলকীপার থাকবে। গোলকীপার না থাকলে খেলা আরম্ভ করা যাবে না। সবচেয়ে কম কতজন খেলোয়াড় থাকতে পারে এ নিয়ে ফুটবলের আইনে সঠিকভাবে কিছু বলা না থাকলেও আইন-বইতে এ-বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্ষদের অভিমত দেওয়া আছে—৭ জন। খেলোয়াড় বদল করা যেতে পারে—তবে দু'জনের বেশি নয়। আর 'ফাউল' বা অসদাচরণের জন্যে কোনও খেলোয়াড় যদি মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হয়, তার জায়গায় নতুন খেলোয়াড় খেলতে পারবে না। বদলী খেলোয়াড়দের নাম খেলা আরম্ভ হবার আগেই রেফারীকে জানিয়ে রাখতে হয়। খেলার মধ্যে রেফারীকে না জানিয়ে বদলী খেলোয়াড় মাঠে ঢুকবে না।

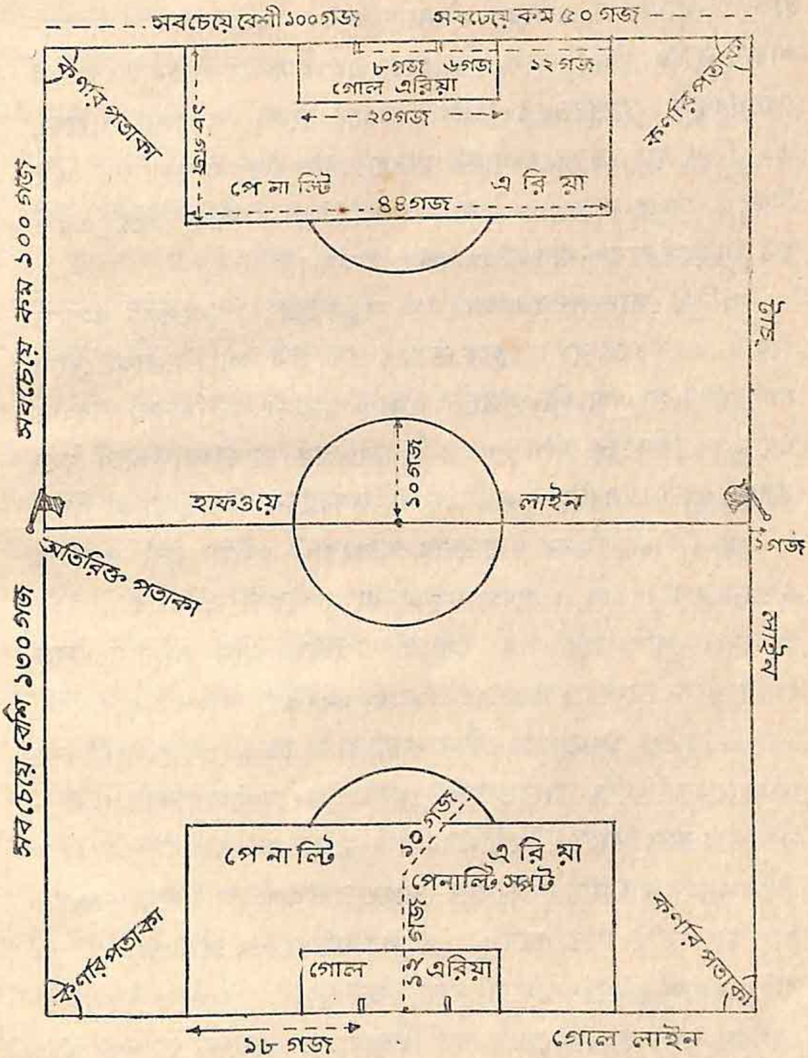
ফুটবল খেলা মানে দু'দলের খেলোয়াড়রা একটি বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে এই উদ্দেশ্যে, যাতে এক দল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনসম্মতভাবে অপরদলের গোলে বলটি ঢুকিয়ে দিতে পারে। যে দল বেশিবার এইরকম করবে বা গোল করবে সেই দল জয়ী হবে, অপরদল পরাজিত হবে। যদি কোনও দলই গোল করতে না পারে বা দু'দলই সমসংখ্যক গোল করে তাহলে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে বা 'ড্র' হয়েছে বলা হয়। (তোমরা, যারা খেল বা খেলা দেখ তারা নিশ্চয়ই বলে উঠবে, 'এ আবার নতুন কথা কী? এ সবই তো আমরা জানি।' কিন্তু সত্যিই কি তাই?) এই অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটির মধ্যেই ফুটবলের সমস্ত আইনের সংক্ষিপ্তসার রয়েছে বলা চলে। আইনসম্মতভাবে বা বৈধভাবে বলটি অপর গোলে নিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো মাঠের সীমারেখার মধ্যে বলটি রেখে, হ্যাণ্ডবল, ফাউল না করে, অফ্-সাইড না হয়ে গোল করা।

আবার আক্রমণকারী দল বৈধভাবে বল নিয়ে গিয়ে গোল দেবার চেষ্টা করলেই যে আত্মরক্ষাকারী দল আইনসম্মতভাবে বাধা দেবে এমন ধারণা করার কোনও কারণ নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, তারা প্রাণপণ চেষ্টা করবে প্রতিপক্ষকে বাধা দিতে, যাতে গোল না হয়, আর এটা করতে গিয়ে তারা দু'চারটি ফাউল করতে পারে, 'পেনাল্টি' করে দিতে পারে, কর্ণার করে দিতে পারে, বল মেরে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারে, হাত দিয়ে বল ধরে ফেলতে পারে বা আরও অনেক কিছুই করতে পারে, যেগুলি আইনবিরুদ্ধ। এই সব ক্ষেত্রেই তারা দণ্ড পাবে, কিন্তু সব দোষেই তো আর সমান দণ্ড নয়। কোথাও ডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্, কোথাও বা ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্, কোথাও পেনাল্টি-কিক্, আবার কোথাও বা কর্ণার-কিক্ বা থ্রো-ইন।

আবার আক্রমণকারী দলও শেষ পর্যন্ত বৈধভাবে গোল করতে সক্ষম হতে নাও পারে। বলটি হয়তো বাইরে চলে গেল। কিংবা বলটি গোলে ঢুকবে এমন সময় গোলকীপারকে ল্যাঙ্ মেরে তাদের একজন ফেলে দিল ; গোলকীপার পড়ে গেল ও বলটি বিনা বাধায় গোলে ঢুকল। সুতরাং তোমাদের সব কিছুই জানতে হচ্ছে—মাঠের সীমানা, খেলার সময়, অফ্-সাইড, কর্ণার-কিক্, ডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্, ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্, ফাউল ও অন্যান্য অসদাচরণ—সব কিছু।

ফুটবল মাঠটি হবে আয়তক্ষেত্রাকার। মাঠের দৈর্ঘ্য ১৩০ গজের (১২০ মিটার) বেশি হবে না বা ১০০ গজের (৯০ মিটার) কম হবে না। প্রস্থ ১০০ গজের বেশি হবে না ও ৫০ গজের (৪৫ মিটার) কম হবে না। আন্তর্জাতিক ম্যাচে দৈর্ঘ্য ১২০ গজের (১১০ মিঃ) বেশি বা ১১০ গজের (১০০ মিটার) কম এবং প্রস্থ ৮০ গজের (৭৫ মিটার) বেশি বা ৭০ গজের (৬৪ মিটার) কম হবে না। সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখতে হবে দৈর্ঘ্য যেন প্রস্থের চেয়ে বেশি হয়।

মাঠের চতুর্দিকে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে হবে, এই রেখাগুলি ৫ ইঞ্চির (০.১২ মিটার) বেশি চওড়া হবে না। ইংরাজী 'ভি' অক্ষরের



ফুটবল মাঠ

মত গর্ত কেটে সীমারেখা ঠিক করা যাবে না। দীর্ঘতর সীমারেখা হু'টিকে টাচ্-লাইন এবং ক্ষুদ্রতর হু'টিকে গোল-লাইন বলা হয়। মাঠের

চারকোণে চারটি কর্ণার-পতাকা পুঁততে হবে। পতাকার দণ্ড ৫ ফুটের (১.৫০ মিটার) কম উঁচু হলে চলবে না। মাঠের ঠিক মাঝামাঝি হাফওয়ে-লাইন বা মধ্যরেখা টানতে হবে। বলা বাহুল্য, সাইড-লাইন দু'টির মধ্য-বিন্দুকে যুক্ত করে এই হাফওয়ে-লাইন। মাঠের কেন্দ্রবিন্দুটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। বুঝতেই পারছো, এই বিন্দু হবে হাফওয়ে-লাইন বা মধ্যরেখার ঠিক মাঝখানে। এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে ১০ গজ (৯.১৫ মিটার) ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে—যার নাম সেন্টার-সার্কল।

প্রতিটি গোল-লাইনে কাঠের বা ধাতুর তৈরি গোলপোস্ট বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে যেন, পোস্ট দু'টি কর্ণার-পতাকা থেকে সমদূরবর্তী হয় এবং দুই পোস্টের মধ্যে ৮ গজ (৭.৩২ মিটার) ব্যবধান থাকে (ভিতরের মাপ)। দু'টি পোস্টকে আড়াআড়িভাবে যুক্ত করবে একটি ক্রসবার। মাটি থেকে ক্রসবারের নিচের দিক পর্যন্ত ৮ ফুট (২.৪৪ মিটার) ব্যবধান থাকবে। পোস্ট এবং ক্রসবার চওড়ায় সমান হবে; এদের চওড়া বা গভীরতা ৫ ইঞ্চির (০.১২ মিটার) বেশি হবে না। গোলের পিছনে জাল লাগালে জাল গোলপোস্ট, ক্রসবার এবং মাঠের সঙ্গে এমনভাবে খাটাতে হবে, যেন গোলকীপারের চলাফেরায় কোন অসুবিধা না হয়। গোলপোস্ট এবং ক্রসবার বর্গাকৃতি, আয়তাকৃতি, গোলাকার, অর্ধগোলাকার বা উপ-বৃত্তাকার হতে পারে। পোস্টগুলিতে সাদা রং লাগানো উচিত। গোল-লাইন যতখানি চওড়া হবে গোলপোস্ট এবং ক্রসবারকে ততখানি ঘন বা গভীর হতে হবে। গোলের জাল তৈরি হবে শন, পাট বা নাইলনের দড়ি দিয়ে—মোটা দড়ি দিয়ে নয়। প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যদি ক্রসবার ভেঙে যায় বা স্থানচ্যুত হয়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে খেলা থামাতে হয়। আর যতক্ষণ না ক্রসবার বদল করা বা সঠিকভাবে বসানো হচ্ছে ততক্ষণ খেলা আরম্ভ করা যাবে না।

(প্রতিটি) গোলপোস্টের দু'দিকেই বাইরের দিক থেকে গোল-

লাইন ধরে ৬ গজ (৫.৫০ মিটার) দীর্ঘ সরলরেখা টানতে হবে। এই সরলরেখা দু'টিকে আবার গোল-লাইনের সঙ্গে লম্ব করে মাঠের ভিতরের দিকে নিয়ে ঠিক ৬ গজ (৫.৫০ মিটার) যেতে হবে। সরলরেখা দু'টিকে গোল-লাইনের সমান্তরাল একটি সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করতে হবে। এই নতুন রেখাটির দৈর্ঘ্য হবে (৬+৮+৬ গজ বা ৫.৫০+৭.৩২+৫.৫০ মিটার) অর্থাৎ ২০ গজ (১৮.৩২ মিটার) এবং গোলের সামনে এই যে ২০ গজ দৈর্ঘ্য ও ৬ গজ প্রস্থযুক্ত (১৮.৩২ × ৫.৫ বর্গ মিঃ) ক্ষেত্রটি তৈরি হলো তাকে বলা হয় **গোল-এরিয়া**। গোলকীপার যদি বল না ধরে থাকে বা বিপক্ষের প্রতিবন্ধকতার (অবস্ট্রাকশন) কারণ না হয়, তা হলে গোল-এরিয়ার মধ্যে তাকে কেউ চার্জ করতে পারে না।

গোল-এরিয়া আর পেনাল্টি-এরিয়া এক কথা নয়। পেনাল্টি-এরিয়ার আয়তন অনেক বড়। উপরে গোলপোস্ট থেকে ৬ গজ (৫.৫০ মিটার) দূরে যেমন গোল-লাইনের উপর লম্ব করে ৬ গজ (৫.৫০ মিটার) দীর্ঘ রেখা টানার কথা বলা হয়েছে, ঠিক একইভাবে গোল-পোস্টের দু'দিকে ১৮ গজ (১৬.৫০ মিটার) দূরে গোল-লাইনের উপর লম্ব করে ১৮ গজ (১৬.৫০ মিটার) দীর্ঘ দু'টি রেখা টানতে হবে এবং এই রেখা দু'টিকে গোল-লাইনের সমান্তরাল একটি রেখা দিয়ে যুক্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য এই নতুন রেখাটির দৈর্ঘ্য হবে ১৮+৮+১৮ গজ (বা ১৬.৫০+৭.৩২+১৬.৫০ মিটার) = ৪৪ গজ (৪০.৩২ মিটার)। সুতরাং গোলের সামনে আর একটি ক্ষেত্র তৈরি হল যার দৈর্ঘ্য ৪৪ গজ ও প্রস্থ ১৮ গজ (৪০.৩২ × ১৬.৫০ বর্গ মিটার)। এই বৃহত্তর ক্ষেত্রটিই **পেনাল্টি-এরিয়া**।

যদি গোল-লাইনের ঠিক মধ্যবিন্দু থেকে গোল-লাইনের উপর লম্ব করে ১২ গজ (১১ মিটার) দীর্ঘ একটি রেখা টানা হত, তা হলে এই রেখার ঠিক শীর্ষের বিন্দুটিই হবে **পেনাল্টি-কিক্ মারার জায়গা বা পেনাল্টি-স্পট**। পেনাল্টি-স্পট থেকে ১০ গজ (৯.১৫ মিটার) ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে টানতে হবে।

প্রত্যেক কর্ণার-পতাকার দণ্ড থেকে একগজ (১ মিটার) ব্যাসার্ধ নিয়ে মাঠের মধ্যে একটি বৃত্তচাপ আঁকতে হবে। একগজ (১ মিটার) গোল-লাইন, একগজ (১ মিটার) সাইড-লাইন ও এই চাপের মধ্যের অংশটুকুই কর্ণার-এরিয়া।

বলটি গোলাকার হবে এবং এর বহিরাবরণ চামড়ার তৈরি হবে। বলের পরিধি ২৭ ইঞ্চির (৬৮ সেন্টিমিটার) কম বা ২৮ ইঞ্চির (৭১ সেন্টি-মিটার) বেশি হবে না। খেলা আরম্ভের সময় বলের ওজন ১৪ আউন্সের (৩৯৭ গ্রাম) কম বা ১৬ আউন্সের বেশি (৪৫৩ গ্রাম) হবে না।

কোন খেলোয়াড় এমন কিছু পরবে না যা অন্য খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক। বুটও নিয়মমাফিক হওয়া দরকার। খেলোয়াড়-দের সাধারণ পোশাক হল জার্সি বা শার্ট, হাফপ্যাণ্ট, মোজা ও বুট। গোলকীপারকে অবশ্যই এমন কিছু পরতে হবে যাতে অবশিষ্ট খেলো-য়াড়দের সঙ্গে তার পার্থক্য বোঝা যায়। দু'দলের জার্সি একরকম হলে চলবে না।

বুট পরতেই হবে, আইনে এমন কথা নেই। তবে প্রতিযোগিতা-মূলক খেলায় রেফারী কোন খেলোয়াড়কে বুট ছাড়া খেলতে দেবেন না, যদি (সেই প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী) আর সব খেলোয়াড় বুট পরে খেলে। আন্তর্জাতিক খেলায় খেলা আরম্ভ হবার আগে রেফারী দেখে নেবেন খেলোয়াড়দের বুট আইনসম্মত কিনা।

প্রত্যেক খেলা পরিচালনা করেন রেফারী। তাঁকে সহায়তা করেন দু'জন লাইন্সম্যান। রেফারীর উপর কথা বলবার অধিকার কারও নেই। তিনি যেভাবে আইন প্রয়োগ করবেন সেটাকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে হবে। রেফারী প্রয়োজনমত খেলা থামাতে পারবেন। অবশ্য নষ্ট সময় পরে যোগ করতে হবে। কোনো খেলোয়াড় যদি রেফারীর মতে বিপজ্জনকভাবে বে-আইনী খেলা খেলে বা মারামারি করে বা গালাগালি করে বা রেফারীর নির্দেশ মানতে না চায়, তাকে সতর্ক করার বা মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করার অধিকার

রেফারীর আছে। আর কারও এ ক্ষমতা নেই। অনেকের ধারণা রেফারী একবারও সতর্ক না করে কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করতে পারেন না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোনো খেলোয়াড় মারাত্মক রকমের ফাউল করলে রেফারী অবশ্যই তাকে কোনোরকম সতর্ক না করেই বহিষ্কৃত করতে পারেন। আর, কোনো সতর্কিত খেলোয়াড় বার বার অপরাধ করলে তো কথাই নেই।

লাইন্সম্যান দু'জন পতাকার সাহায্যে রেফারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। লাইন্সম্যানের সঙ্কেত বা নির্দেশ রেফারী গ্রহণ না-ও করতে পারেন। লাইন্সম্যান রেফারীর কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করলে রেফারী সেই লাইন্স-ম্যানকে অপসারিত করে অন্য লাইন্সম্যান নিয়োগ করতে পারেন।

অন্য রকম কিছু ঠিক করা না থাকলে খেলা প্রতি অর্ধ ৪৫ মিনিট করে দু'টি অর্ধে হবে। রেফারীর অনুমতি ছাড়া দুই অর্ধের মধ্যে বিরতি ৫ মিনিটের বেশি হবে না। টস্ বা মুদ্রা-ক্ষেপণের সাহায্যে ঠিক হবে কোন্ দল আগে কিক্-অফ্ করবে। যে দল টসে জিতবে সেই দলই ঠিক করবে আগে কিক্-অফ্ করবে, না দিক বেছে নেবে। যে দল কিক্-অফ্ করছে তাদের একজন বলটি মাঠের কেন্দ্রবিন্দু বা সেণ্টারে বসিয়ে কিক্ করার পর বলটি তার পরিধিমত অর্থাৎ ২৭ ইঞ্চি (বা ২৮ ইঞ্চি) দূরত্ব অতিক্রম করে বিপক্ষ অর্ধাংশে গেলেই খেলা চালু হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এই সময় অপরপক্ষের খেলোয়াড়রা বল থেকে অন্ততঃ দশ গজ (৯.১৫ মিটার) দূরে দাঁড়াবে। অর্থাৎ তারা সেণ্টার-সার্কলের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে না।

বল সম্পূর্ণভাবে গোল-লাইন বা টাচ্-লাইন অতিক্রম না করা পর্যন্ত বলটি খেলার মধ্যে বলে ধরতে হবে। গোল হবার ক্ষেত্রেও একই কথা। দেখতে হবে সমগ্র বলটি গোল-লাইন অতিক্রম করেছে কিনা। বলের সামান্যতম অংশও যতক্ষণ গোল-লাইনের উপরে থাকবে ততক্ষণ গোলের সংকেত দেওয়া যাবে না।

যখন সমগ্র বলটি দুই গোলপোস্ট ও ক্রসবারের মধ্যবর্তী জায়গার

অন্তর্গত গোল-লাইন অতিক্রম করে যাবে, তখন গোল হবে। অবশ্য আক্রমণকারী দলের কোনো খেলোয়াড় যদি হাত বা বাহু দিয়ে বলটি ছুঁড়ে দেয় বা বয়ে নিয়ে যায় বা ঠেলে দেয়, তাহলে গোল দেওয়া যাবে না। কিন্তু নিজ পেনাল্টি-এরিয়া থেকে আক্রমণকারী দলের গোলরক্ষক হাত দিয়ে ছুঁড়ে গোল করতে পারে।

যদি কোনো খেলোয়াড় নিম্নলিখিত ৯টি অপরাধের যে কোনো একটি স্বেচ্ছায় করে, তা হলে রেফারী ঐ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধ দলের অনুকূলে ডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্ দেবেন: (১) বিপক্ষের খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা; (২) বিপক্ষের খেলোয়াড়কে 'ট্রিপ্' করা বা পদস্খলিত করা; (৩) বিপক্ষের খেলোয়াড়ের উপর লাফিয়ে পড়া; (৪) মারাত্মক বা বিপজ্জনকভাবে বিপক্ষকে চার্জ করা; (৫) বিপক্ষের খেলোয়াড় 'অবষ্ট্রাকশন' বা প্রতিবন্ধকতা না করা সত্ত্বেও পিছন দিক থেকে তাকে চার্জ করা; (৬) বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করতে উদ্যত হওয়া; (৭) খেলোয়াড়কে হাত বা বাহুর কোনো অংশ দিয়ে ধরে রাখা; (৮) বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে হাত বা বাহুর কোনও অংশ দিয়ে ধাক্কা দেওয়া; (৯) বলে হাত দেওয়া (খেলায় অবশ্য গোলকীপারের নিজ পেনাল্টি-এরিয়ায় হাতে করে বল খেলার অধিকার আছে)। যেখানে অপরাধ ঘটেছে সেই জায়গা থেকে ডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্ নিতে হবে।

আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ইচ্ছা করে যদি এই অপরাধগুলির কোনোটি করে তাহলে ঐ দলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেওয়া হবে। বল মাঠের মধ্যে আছে এমন অবস্থায় পেনাল্টি-এরিয়ায় এইরকম অপরাধ ঘটলেই এই কিকের নির্দেশ দেওয়া হবে—বলটি যেখানেই থাকুক না কেন অর্থাৎ মাঠের মধ্যে বল থাকলেই হল, অপরাধের ঘটনাস্থলে পেনাল্টি-কিক্ দেওয়া হবে। পেনাল্টি-কিক্ মারবার নিয়ম সম্পর্কে পরে বলা হচ্ছে।

যদি কোনো খেলোয়াড় নিম্নোক্ত পাঁচটি অপরাধের যে কোন একটি করে, তবে রেফারী বিপক্ষের অনুকূলে ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিকের নির্দেশ দেবেন এবং যে জায়গায় আইনভঙ্গ হয়েছে, বিপক্ষীয় কোনো খেলোয়াড় সেখান থেকে কিক্ নেবেন : (১) এমনভাবে খেলা যেটা রেফারীর মতে বিপজ্জনক— যেমন, গোলকীপার বল ধরে আছে, তখন বলে কিক্ করার চেষ্টা করা ; (২) বলটি নিজের এবং বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের আয়ত্তের বাইরে থাকা অবস্থায় বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে ন্যায়সঙ্গতভাবে চার্জ করা ; (৩) বলটি না খেলে বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা 'অবস্ট্রাকশন' ; (৪) গোল-কীপার বল ধরে নেই বা বিপক্ষীয় কোনো খেলোয়াড়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না বা গোল-এরিয়ার মধ্যেই আছে—এমন অবস্থায় গোলকীপারকে চার্জ করা ; (৫) গোল-কীপারের নিজ পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে বল ধরে ড্রপ না দিয়ে ৪ পায়ের বেশি যাওয়া বা এমন উপায় অবলম্বন করা যা রেফারীর মতে নিছক সময় নষ্ট করে নিজের দলকে অন্যায় সুযোগ দেওয়া। এ ছাড়া কোনো খেলোয়াড় বার বার খেলার আইনভঙ্গ করলে, কথায় বা কাজে রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে বা অভদ্র আচরণের জন্য দোষী হলে সে সতর্কিত হওয়া ছাড়াও বিপক্ষ ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্ পাবে।

ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিকের মধ্যে পার্থক্য কী?— **ডাইরেক্ট** ফ্রী-কিক্ থেকে সরাসরি গোল করা যায়, কিন্তু ইন-ডাইরেক্ট ফ্রী-কিকের ক্ষেত্রে যে কিক্ নিয়েছে সে ছাড়া অন্য কোনো খেলোয়াড়কে হয়ে বা ছুঁয়ে বলটি গোলে ঢুকতে হবে।

কোনো খেলোয়াড় নিজ পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে ডাইরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্ নেবার সময় বিপক্ষীয় খেলোয়াড়দের অন্ততঃ ১০ গজ (৯.১৫ মিটার) দূরে দাঁড়াতে হবে, বলটি যতক্ষণ না তার পরিধির সমান দূরত্ব যায়। যখন ফ্রী-কিক্ নেওয়া হবে, বলটি সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থায় থাকবে এবং যে কিক্ করে সে বলটিকে দ্বিতীয়-বার স্পর্শ করার আগে অন্য কোনো খেলোয়াড়কে বলটি স্পর্শ করতে

হবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে বিপক্ষের অনুকূলে ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্ দেওয়া হবে। নিজ পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্য থেকে ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্ নেওয়ার বেলায় বিপক্ষের সমস্ত খেলোয়াড়কে পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে দাঁড়াতে হবে। আর আক্রমণকারী দল যদি বিপক্ষ গোল থেকে ১০ গজের (৯.১৫ মিটার) কম দূরত্বের মধ্যে ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্ পায়, তাহলে আত্মরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড়রা দু'টি পোস্টের ভিতর গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে পারবে।

যদি সর্বশেষ আক্রমণকারী দলের কোনও খেলোয়াড়ের ছোঁওয়া লেগে বল গোল-লাইন অতিক্রম করে যায় তাহলে আত্মরক্ষাকারী দল গোল-কিক্ পাবে। গোল-এরিয়ার মধ্যে বল বসিয়ে এই কিক্ করতে হবে এবং পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে পাঠাতে হবে। গোল-কিক্ থেকে বল সরাসরি গোলকীপারের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। খেলা দেখতে দেখতে তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, গোল-কিক্ হওয়ার পর বল পেনাল্টি-এরিয়া পার হয়ে গেলেই তবে আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় তাড়াতাড়ি গোল-এরিয়ার মধ্যে গোলকীপারকে বলটি 'ব্যাকপাস' করে দেয় এবং তারপর গোলকীপার বলটি ধরে উঁচু করে কিক্ করে দলের সুবিধাজনক স্থানে বল পাঠায়। গোল-কিক্ থেকে সরাসরি গোল দেওয়া যায় না। সুতরাং এটিও ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্।

আক্রমণকারী দলের যে-রকম অপরাধে আত্মরক্ষাকারী দল গোল-কিক্ পায়, আত্মরক্ষাকারী দলের সেইরকম অপরাধে আক্রমণকারী দল কর্ণার-কিক্ পাবে। কর্ণার-এরিয়ায় বল বসিয়ে কিক্ করতে হবে। আত্মরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড়রা বলের ১০ গজের মধ্যে আসতে পারবে না—যতক্ষণ না বল নিজের পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করে। আর, দ্বিতীয় কেউ বল খেলবার বা ছোঁড়বার আগে যে কিক্ করেছে সে বলটিকে পুনরায় স্পর্শ করতে পারে না। কর্ণার-কিক্ থেকে সরাসরি গোল করা যায়

যদি বলটি টাচ্-লাইন অতিক্রম করে যায় তাহলে সব শেষে যে

খেলোয়াড়ের ছোঁওয়া বলটিতে লেগেছে, তার বিপক্ষ 'থ্রো-ইন' পাবে। অতিক্রম করার জায়গা থেকে মাঠের দিকে মুখ করে টাচ্-লাইনের উপর বা বাইরে দাঁড়িয়ে বলটি দু'হাতে মাথার পিছন দিক থেকে এনে মাথার উপর দিয়ে মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে না দিলে সঠিক থ্রো-ইন হবে না। থ্রো-ইন আইনসম্মত না হলে বিপক্ষের থ্রো-ইন হবে। থ্রো-ইন থেকে সরাসরি গোল হয় না।

আগেই বলা হয়েছে, যে ৯টি অপরাধের জন্য ডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্ দেওয়া হয়, আত্মরক্ষাকারী দল নিজ পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে সেগুলির কোনোটি করলে রেফারী বিপক্ষকে পেনাল্টি-কিক্ দেবেন। কিকটি পেনাল্টি-স্পট থেকে নিতে হবে। এই সময় যে কিক্ নিচ্ছে সে ও যাদের বিরুদ্ধে পেনাল্টি হয়েছে তাদের গোলকীপার, এই দু'জন ছাড়া আর সকলেই পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে এবং বল থেকে অন্ততঃ ১০ গজ (৯.১৫ মিটার) দূরে দাঁড়াবে। গোলকীপার নিজ গোল লাইনে দুই পোস্টের মাঝখানে পা দু'টি স্থির রেখে দাঁড়াবে—কিক্ নেওয়া পর্যন্ত। যে খেলোয়াড় বলটি কিক্ করবে অন্য কোনো খেলোয়াড় বলটি স্পর্শ করার আগে সে আর বলটি দ্বিতীয়বার খেলতে পারবে না। পেনাল্টি-কিক্ থেকে সরাসরি গোল হতে পারে। যে কিক্ নিচ্ছে সে বাদে আক্রমণকারী দলের অন্য কোনো খেলোয়াড় যদি পেনাল্টি-সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করে তাহলে কিক্‌টি আবার নিতে হবে। আর যদি আত্মরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় আইন ভঙ্গ করে, তা হলেও আবার কিক্ হবে—অবশ্য যদি না গোল হয়ে গিয়ে থাকে। যে কিক্ করছে, সে যদি বলটি খেলার মধ্যে যাবার পর কোনো রকম আইন ভঙ্গ করে, তবে ঘটনাস্থল থেকে বিপক্ষ ইনডাইরেক্ট ফ্রী-কিক্ পাবে। বার বার 'ড্র' হওয়া খেলার মীমাংসার জন্যে যে 'টাই-ব্রেকার' প্রথা অনুসরণ করা হয় তাতেও পেনাল্টি-কিক্ করানোর ব্যবস্থা আছে। পাঁচটি (বা প্রয়োজন হলে তার বেশি) কিক্ থেকে যে দল বেশি গোল করে সেই দল জয়ী হয়।

সব শেষে অফ্-সাইডের কথা বলি। বস্তুতঃ পেনাল্টি আর অফ্-সাইড নিয়েই ফুটবলে যত গণ্ডগোল। যে মুহূর্তে বলটি খেলা হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে বলের চেয়ে বিপক্ষ গোল-লাইনের বেশি কাছে থাকলে একজন খেলোয়াড় অফ্-সাইডে আছে বলে ধরা হবে, যদি না (১) সে মাঠের নিজ অর্ধাংশে থাকে, বা (২) অন্ততঃ ২ জন বিপক্ষীয় খেলোয়াড় তার থেকে তাদের নিজেদের গোল-লাইনের বেশি কাছে থাকে, বা (৩) বলটি শেষ একজন বিপক্ষীয় খেলোয়াড় স্পর্শ করেছে বা খেলেছে, বা (৪) গোল-কিক্, কর্ণার-কিক্, থ্রো-ইন কিংবা রেফারীর ড্রপ থেকে সে সরাসরি বল পেয়ে থাকে। **অফ্-সাইড বিচার করার বিষয়ে দু'টি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ।** প্রথম কথা, দেখতে হবে **যখন স্বপক্ষ খেলোয়াড় বলটি খেলেছিল** তখন সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়টি কোথায় ছিল—অফ্-সাইডে না অন্-সাইডে—**যখন** সে নিজেই **বলটি খেলে তখন কোথায় আছে, তা নয়।** দ্বিতীয়তঃ, অফ্-সাইডে থাকা সত্বেও একজন খেলোয়াড় দণ্ডিত হবে না, যদি না রেফারীর মতে সে খেলায় কোনোরকম বাধা দিচ্ছে বা ঐ অবস্থায় থেকে কোনো সুবিধা পাচ্ছে।

ফ্রী-কিক্ বা পেনাল্টি-কিক্ দেওয়ার সময়ও অফ্-সাইড আইন প্রযোজ্য।

ফুটবলের আইনের মূল কথাগুলি এখানে বলা হল। এ-সব নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা আছে, কিন্তু এখানে সেগুলি না জানলেও আমাদের ক্ষতি নেই।

এই আলোচনা শেষ করার আগে আর দু'একটা কথা জেনে রাখা ভালো। যে সব ক্ষেত্রে দণ্ড দিলে অপরাধী দলের সুবিধা হবে, সেই সব ক্ষেত্রে রেফারী দণ্ড দেবেন না। এই নিয়ম অর্থাৎ অ্যাডভান্টেজ ক্লজ ফুটবলে ও হকিতে আছে। (হকির অংশ দেখ)। কোনো খেলোয়াড় একই সঙ্গে দু'টি অপরাধ করলে গুরুতর অপরাধটির জন্যেই রেফারী দণ্ড দেবেন। কোনো দল মাঠে আসেনি অথচ প্রতিপক্ষ

উপস্থিত বা খেলতে খেলতে একটি দল কোনো কারণে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল—সে ক্ষেত্রে রেফারী অপর দলকে জয়ী ঘোষণা করতে পারেন না। রেফারীর এই ক্ষমতা নেই। রেফারী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাঁশী বাজিয়ে খেলাটির সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এবং খেলাটি সম্পর্কে পরিচালক সমিতির কাছে যে রিপোর্ট পেশ করবেন তাতে বিষয়টি জানাবেন। কোনো খেলোয়াড়কে সতর্কিত বা মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করলেও তাঁর রিপোর্টে ঘটনাটির উল্লেখ করবেন।

হকি

আমরা সাধারণতঃ যে ধরনের হকি খেলি বা দেখে থাকি তাকে খেলাধূলার পরিভাষায় 'ফিল্ড হকি' বলা হয়। বরফের উপর এক ধরনের হকি খেলা হয়, যার নাম 'আইস হকি'। এই দুই হকি খেলার মধ্যে পার্থক্য বোঝাবার জন্যেই দু'রকম নাম দেওয়া হয়েছে। যা-ই হোক, আমরা এখানে 'ফিল্ড হকি' নিয়ে আলোচনা করলেও শুধু 'হকি' বলেই একে উল্লেখ করছি। বিদেশে অনেক জায়গায় অবশ্য শুধু 'হকি' বললে লোকে 'আইস হকি'-র কথাই বুঝবে, এবং সেখানে আমাদের আলোচ্য হকি খেলার কথা বোঝাতে হলে তাকে 'ফিল্ড হকি' বলে উল্লেখ করতে হবে।

আমাদের দেশে হকি খেলা জনপ্রিয়তার দিক থেকে ফুটবল বা ক্রিকেটের চাইতে অনেক পিছনে পড়ে আছে। অথচ এ-রকম হওয়া উচিত ছিল না। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে হকি যত সম্মান এনে দিয়েছে, অন্য কোন খেলা তা পারেনি। ক্রিকেটে ভারতের বিশ্বজোড়া খ্যাতি তো মাত্র কয়েক বছর আগে হয়েছে। আর ফুটবলের কথা বলাই বাহুল্য। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রতিবারই ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হকিতে প্রথম স্থান পেয়ে ভারত স্বর্ণপদক পেয়ে এসেছে। কিন্তু ১৯৬০ সালে রোম ওলিম্পিকে ভারতকে এক গোলে হারিয়ে পাকিস্তান স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নেয় এবং

ভারতের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আজকাল এই দুই দেশ ছাড়া আরও অনেক দেশ হকিতে প্রভূত উন্নতি করেছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড, স্পেন, নিউজিল্যাণ্ড, কেনিয়া প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ১৯৭৩ সালে আমস্টার্ডামে দ্বিতীয় বিশ্ব-কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে এক সময় দু'গোলে পিছিয়ে থেকেও হল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত যেভাবে ভারতকে পরাজিত করেছে, সেটা ভারতের পক্ষে লজ্জার কথা হলেও, নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে হল্যাণ্ডের পক্ষে প্রশংসনীয়।

হকি খেলার প্রচলন যে ঠিক কবে এবং কোথায় প্রথম হয়, তা বলা শক্ত। তবে খেলাটি যে অতি প্রাচীন এ বিষয়ে একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের একটি সমাধিক্ষেত্রের এক কক্ষে 'বুলি' করার ভঙ্গিমায় দু'জন হকি খেলোয়াড়ের চিত্র আছে এবং পণ্ডিতেরা বলেন, এটি ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডেও হকির উল্লেখ পাওয়া গেছে। ইংল্যাণ্ডের কেন্ট কাউন্টিতে অবস্থিত ব্ল্যাকহীথই প্রাচীনতম হকি ক্লাব। এটি স্থাপিত হয় ১৮৬১ সালে। ১৮৯৫ সালে ওয়েলসের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের যে খেলা হয় সেটাই প্রথম আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ। আয়ার্ল্যাণ্ড সেই খেলায় ৩—০ গোলে জিতেছিল।

হকি খেলার নিয়ম-কানুন অনেকটা ফুটবল খেলার মত, যদিও খুঁটিনাটির দিক থেকে এই দুই খেলার মধ্যে অনেক পার্থক্যই আছে। ফুটবলের মতই হকিতে এক-এক দলে ১১ জন করে খেলোয়াড় থাকে এবং জয়-পরাজয়ের মীমাংসা গোলের মাধ্যমেই হয়। তবে হকিতে মাঠ, গোল ও বল সবই ছোট। সবচেয়ে বড় কথা, ফুটবল হল পায়ের খেলা। কিন্তু হকিতে বলে পা দেওয়াই অপরাধ। হকিতে স্টিকের সাহায্যেই খেলতে হয়। আবার ফুটবলে 'হ্যাণ্ডবল' দণ্ডনীয়, কিন্তু হকিতে বল থামানোর জন্যে 'হাত ছাড়া শরীরের আর কোনো অংশ ব্যবহার করা চলবে না'—একথা হকির আইনে স্পষ্ট করেই

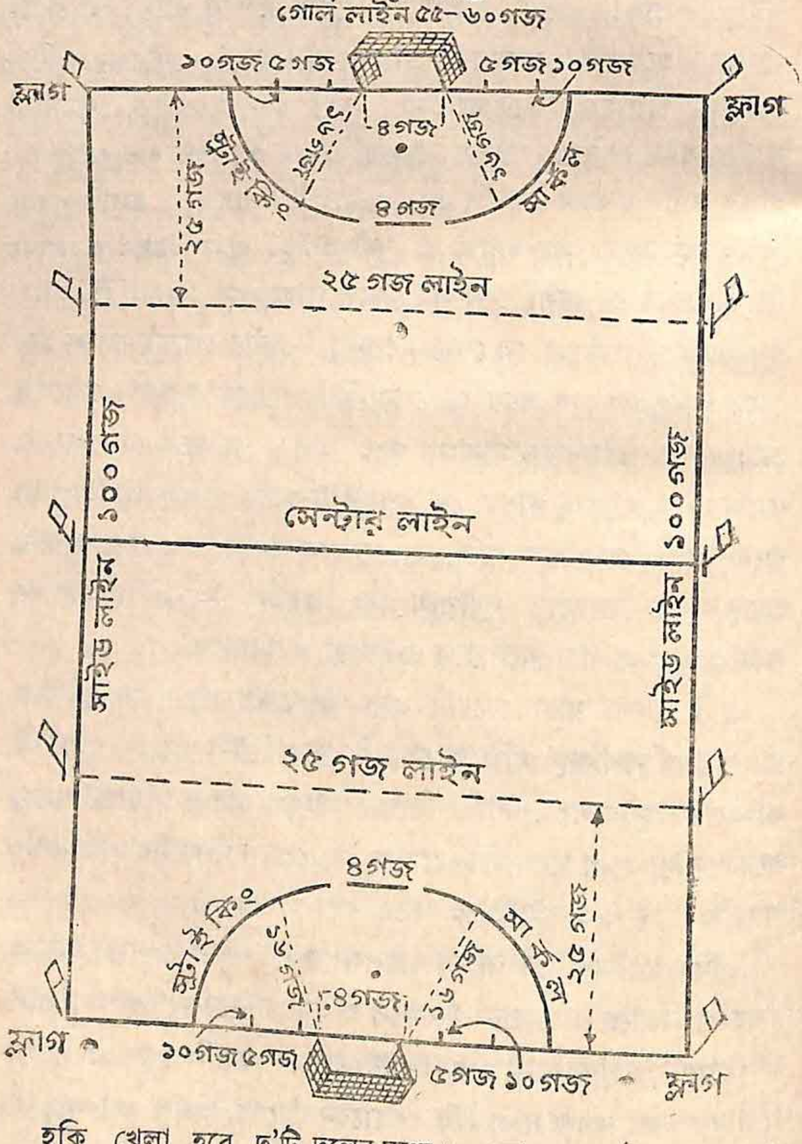
বলে দেওয়া হয়েছে। আর একটি প্রয়োজনীয় পার্থক্য হল, ফুটবলে মাঠের যে কোনো জায়গা থেকেই 'গোল' করা যায়—এমন কি গোলকীপার হাত দিয়ে বল ছুঁড়ে গোল করতে পারলে সেটিও আইনসঙ্গত। কিন্তু হকির বেলায় তা হয় না। হকিতে একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ষ্টিকের সঙ্গে বলের সংস্পর্শ ঘটিয়ে বল গোলে ঢোকাতে হবে। সুতরাং 'বল গোলে ঢুকলেই গোল'—ফুটবলে এ নিয়ম মোটামুটি চললেও হকিতে চলে না। হকিতে অফ্-সাইড, পেনাল্টি, কর্ণার সবই আছে, তবে সব ক্ষেত্রেই নিয়ম প্রয়োজনমত আলাদা। হকির কর্ণার দু'রকম—কর্ণার এবং পেনাল্টি-কর্ণার। (চল্তি কথায় এদের যথাক্রমে 'লঙ-কর্ণার' ও 'শর্ট-কর্ণার' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।) হকি খেলা দেখলেই বুঝতে পারবে যে, 'পেনাল্টি-কর্ণার' খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যে কোনো পেনাল্টি-কর্ণার থেকেই গোল হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় এই পেনাল্টি-কর্ণার থেকে হওয়া গোলেই খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। যে দলে এমন অন্ততঃ একজন খেলোয়াড় থাকে যে পেনাল্টি-কর্ণার থেকে প্রায়ই গোল করে থাকে সে-দলের শক্তি ও মনোবল নিঃসন্দেহে অনেকখানি বেড়ে যায়। ভারতের পৃথ্বীপাল সিং, সুর্জিৎ সিং; পাকিস্তানের তানবির-দার প্রভৃতি খেলোয়াড় এ-বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত।

হকি খেলা যারা দেখেনি এমন অনেকের ধারণা যে, ফুটবলে যা 'পেনাল্টি-কিক্' হকিতে সেটাই পেনাল্টি-কর্ণার। মোটেই তা নয়। ফুটবলের পেনাল্টি-কিকের অনুরূপ ব্যবস্থা হকিতে আছে, তবে সেটা হলো 'পেনাল্টি-ষ্ট্রোক। 'পেনাল্টি-কর্ণার' জিনিসটা আলাদা। (পরে এই বিষয়ে আরো বলা হয়েছে।)

হকির আইন-বইতে কুড়িটি ধারা আছে। অবশ্য এগুলির অনেক উপধারাও আছে। এখানে সংক্ষেপে হকির আইনের মূল কথাগুলি বলা হচ্ছে। হকি খেলতে এবং খেলা দেখতে এগুলি অন্ততঃ জেনে রাখা দরকার। অবশ্য যারা হকি খেলাবেন তাঁদের, অর্থাৎ আম্পায়ার-

দের (হকিতে ক্রিকেটের মত 'আম্পায়ার' কথাটি ব্যবহার করা হয়) সব কিছুই ভালোভাবে জানা উচিত। হকি খেলায় দু'জন আম্পায়ার বাঁশী বাজিয়ে খেলা পরিচালনা করে থাকেন।

হকির মাঠ



হকি খেলা হবে দু'টি দলের মধ্যে। কোনো দলেই ১১ জনের

বেশি খেলোয়াড় বা একাধিক গোলকীপার খেলতে পারবে না। অবশ্য যে কোনো দলই ২ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় বদল করতে পারে। সাধারণতঃ ৭০ মিনিট ধরে হকি খেলা হয়—প্রতি অর্ধে ৩৫ মিনিট করে এবং দু'টি অর্ধের মধ্যে ৮ মিনিট বিরতি থাকে।

খেলার মাঠের মাপ : খেলার মাঠটি আয়তক্ষেত্রাকার হবে—লম্বায় হবে ১০০ গজ (৯১.৪৫ মিটার) এবং চওড়ায় ৫৫ গজের (৫০.৩ মিটার) কম বা ৬০ গজের (৫৭.৮৬ মিটার) বেশি হবে না।

মাঠের দাগ : মাঠের চারধারে সাদা দাগ টানতে হবে। গোল-লাইনগুলি অর্থাৎ প্রতি গোলের দু'দিকের দাগগুলি ৩ ইঞ্চি (৭.৬২ সেন্টিমিটার) চওড়া হবে। উভয় গোল থেকে ২৫ গজ (২২.৮৬ মিটার) দূরে গোল-লাইনের সমান্তরাল করে দু'পাশে সীমারেখা (সাইড-লাইন) পর্যন্ত দাগ টানতে হবে। এর ফলে যে এলাকা তৈরি হয় তাকে রক্ষণকারী দলের 'পঁচিশ-গজ এলাকা' বলা হয়।

ফ্ল্যাগ : মাঠের চারকোণে চারটি, দু'টি 'পঁচিশ-গজ লাইনে'র দু'পাশে দু'টি করে চারটি এবং মাঠের সেন্টার-লাইনের দু'দিকে দু'টি—মোট দশটি ফ্ল্যাগ বা পতাকা থাকবে। ফ্ল্যাগ-পোস্ট বা পতাকা-দণ্ডগুলির উচ্চতা অন্ততঃ চার ফুট (১.২২ মিটার) হতে হবে। মধ্যবর্তী ফ্ল্যাগগুলি সাইড-লাইনের একগজ বাইরে থাকবে।

গোল, পোস্ট ইত্যাদি : গোল-লাইনের ঠিক মাঝখানে গোল থাকবে। দু'টি পোস্টের মধ্যে ব্যবধান থাকবে ৪ গজ (৩.৬৬ মিটার)। এ দু'টিকে যুক্ত করে একটি ক্রসবার। পোস্ট ও বার দু'ইঞ্চি (৫ সেন্টি-মিটার) চওড়া হবে। মাটি থেকে ক্রসবারের মাপ (ভিতর দিকে) সাত ফুট (২.১৩ মিটার) হবে। গোলে জাল দিতেই হবে। শুধু তাই নয়, গোলের পিছনে গোল-সংলগ্ন বোর্ড বা গোল-বোর্ড বসাতে হবে। গোল-লাইন থেকে পিছনের বোর্ডের ব্যবধান হবে ৪ ফুট (১.২২ মিটার)।

স্ট্রাইকিং-সার্কল সম্বন্ধে ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার। কারণ, শুধু স্ট্রাইকিং-সার্কলে থাকাকালীন অবস্থাতেই কোনো

খেলোয়াড় বলে হিট করে বা বল কোনো খেলোয়াড়ের স্টিক ছুঁয়ে গোলে ঢুকলে তবে গোল হবে। আগে যে 'নির্দিষ্ট এলাকার' মধ্যে থেকে গোল হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এটাই সেই নির্দিষ্ট এলাকা। দুই গোলের সামনে গোল-লাইন থেকে ১৬ গজ (১৪.৬৩ মিটার) দূরে গোল-লাইনের সমান্তরাল করে ৪ গজ (৩.৬৬ মিটার) লম্বা এবং তিন ইঞ্চি (৭.৬২ সেন্টিমিটার) চওড়া সাদা লাইন টানতে হবে। এই চওড়া বজায় রেখে দু'দিকে লাইনটিকে এমনভাবে টেনে নিতে হবে, যেন সেটি গোল-লাইনের সঙ্গে মিশে দু'ধারে একটি সিকি-বৃত্ত তৈরী করে। এই লাইনগুলির এবং গোল-লাইনের মাঝখানের জায়গাটিকেই স্ট্রাইকিং-সার্কল বলা হয়। (এর পর থেকে শুধু 'সার্কল' বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।) ৪৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া ছবি থেকে মাঠ ও গোলের মাপ, স্ট্রাইকিং-সার্কল প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হবে। ছবি দেখলেই বোঝা যাবে যে, সার্কল দু'টিকে ইংরাজী বর্ণমালার 'D' অক্ষরের মত দেখায়। এই জন্যই খবরের কাগজে খেলার রিপোর্টে বা রেডিওতে ধারা-বিবরণী দেওয়ার সময় অনেকে সার্কলকে 'ডি' বলে উল্লেখ করে থাকেন।

স্টিক ও বল সম্পর্কেও কিছু জানা দরকার। হকির বল গঠনে, আকৃতিতে ও ওজনে ক্রিকেট বলেরই মত, তবে বলের রঙটি সাদা না হলে চলবে না। বলের ওজন ৫$\frac{১}{২}$ আউন্সের (১৫৬ গ্রাম) কম বা ৫$\frac{৩}{৪}$ আউন্সের (১৬৩ গ্রাম) বেশি হবে না, আর ঘের ৮$\frac{১৩}{১৬}$ ইঞ্চির (২২.৪ সেন্টিমিটার) কম বা ৯$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চির (২৩.৫ সেন্টিমিটার) বেশি হবে না। স্টিকের বাঁ দিকটি সমতল হতে হবে এবং মাত্র এই দিক দিয়েই বল খেলা যাবে। এই দিকটিকে স্টিকের মুখ বলা হয়। স্টিকের অন্যদিকে বল মারা দণ্ডনীয়। স্টিকের ওজন ২৮ আউন্সের (৭৯৪ গ্রাম) বেশি বা ১২ আউন্সের (৩৪০ গ্রাম) কম হবে না। কোনো স্টিক আইনসঙ্গত না হলে আম্পায়াররা সেটি ব্যবহার করতে দেবেন না। কোনো খেলোয়াড় এমন বুট বা অন্যরকম এমন কিছু ব্যবহার করতে পারবে না, যা অন্যান্য খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক।

বুলি : খেলা আরম্ভ করতে, হাফ-টাইমের পর এবং গোল হবার পর পুনরারম্ভ করতে 'বুলি' করা হয়। উভয় দলের একজন খেলোয়াড় সেন্টার-লাইনের ঠিক মাঝখানে বলটি বসিয়ে যথাযথভাবে দাঁড়ায় এবং তারপর 'বুলি' করা হয়। বল সাইড-লাইনের বাইরে বেরিয়ে গেলে অপরাধী খেলোয়াড়ের বিপক্ষ 'পুশ্-ইন' পাবে। ফুটবলে যেমন 'থ্রো-ইন' হকিতে তেমনি 'পুশ্-ইন'। কোনও একজন খেলোয়াড় বলটি স্টিকের সাহায্যে মাঠের মধ্যে ঠেলে দেয়।

বিভিন্ন অপরাধ : স্টিকের 'মুখ' বা সামনের দিক ছাড়া অন্য কোনও দিক দিয়ে বল মারা যাবে না। বল মারার আগে বা পরে স্টিকের কোনও অংশ খেলোয়াড়ের কাঁধ ছাড়িয়ে উপরে উঠে যাবে না। হাত ছাড়া শরীরের অন্য কোনও অংশ বলে লাগানো চলবে না। বিপজ্জনকভাবে বল মারা চলবে না।

কেউ বিরুদ্ধ-পক্ষের কোনও খেলোয়াড়কে চার্জ করতে, লাথি মারতে, ধাক্কা দিতে, ল্যাং মারতে, কোনও রকম আঘাত করতে বা কোনও রকমে ধরে রাখতে পারে না, এমন কি তার স্টিকেও আঘাত করতে বা স্টিক আঁকশির মত টেনে ধরে রাখতেও পারে না।

আত্মরক্ষাকারী দলের কোনও খেলোয়াড় নিজ সার্কলের মধ্যে এই সব আইনের কোনও একটি ভঙ্গ করলে আম্পায়ার অপর দলের পক্ষে পেনাল্টি-কর্ণার বা পেনাল্টি-স্ট্রোকের নির্দেশ দিতে পারেন। এ ছাড়া বিপজ্জনকভাবে খেলার অপরাধে অপরাধী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দিতে বা মাঠ থেকে বের করে দিতে পারেন। কোনও রকম বলপ্রয়োগের বা বিপজ্জনক খেলা আম্পায়াররা চলতে দেবেন না, সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

হকিতে মার বা 'হিট'কে যেমন আইনসঙ্গত হতে হয় – 'যেমন-তেমন'-ভাবে বল মারলেই হয় না, গোলের বেলাতেও সেই রকম। 'যেখান-সেখান' থেকে বল মারলেই গোল হবে না। প্রতিপক্ষের সার্কলের মধ্য থেকে ছাড়া গোল করা যাবে না। বলটি গোল-লাইন

অতিক্রম করার আগে যেন আক্রমণকারী দলের কোনও খেলোয়াড় মারে বা বলটি যেন অন্ততঃ ঐ দলের কোনও একজন খেলোয়াড়ের স্টিক থেকে আসে। যে দল বেশি-সংখ্যক গোল করবে সেই দলই বিজয়ী ঘোষিত হবে।

ফুটবলের মত হকিতেও অফ্-সাইড আছে। যে মুহূর্তে বলটি মারা হয় বা 'পুশ্-ইন' করা হয়, তখন যে-দলের খেলোয়াড় বলটি মেরেছে বা 'পুশ্-ইন' করেছে সেই দলের অন্য কোনও খেলোয়াড় বলের চেয়ে এগিয়ে বিপক্ষ গোল-লাইনের কাছাকাছি থাকলে অফ্-সাইড হবে, যদি না (১) সে মাঠের নিজ অর্ধাংশে থাকে, (২) বিপক্ষের অন্ততঃ তিনজন খেলোয়াড় তার চেয়ে নিজেদের গোল-লাইনের বেশি কাছে থাকে, বা (৩) যে বল মেরেছে বা 'পুশ্-ইন' করেছে সে এই খেলোয়াড়ের চেয়ে বিপক্ষ গোল-লাইনের বেশি কাছে থাকে। অবশ্য অফ্-সাইডে থেকেও কোনও খেলোয়াড় যদি কোনও সুবিধা না পায় বা বিপক্ষের কোনও খেলোয়াড়ের 'বাধা' হয়ে না দাঁড়ায়, তা হলে সে দণ্ডিত হবে না। কোনও খেলোয়াড় অফ্-সাইডে কিনা জানতে হলে দেখতে হবে 'বলটি যখন তার দলের খেলোয়াড় মেরেছে বা পুশ্-ইন করেছে, সেই মুহূর্তে সে কোথায় ছিল'। যখন সে নিজেই বলটি খেলছে তখনকার কথা উঠছে না।

কোনও খেলোয়াড় অফ্-সাইড-সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করলে আত্মরক্ষাকারী দল 'ফ্রী-হিট' পাবে। 'ফ্রী-হিট' কী? ঠিক যে জায়গায় অপরাধ ঘটে সেইখানে বলটিকে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থায় বসিয়ে রেখে মারতে হয়। অফ্-সাইড ছাড়াও অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ফ্রী-হিট হয়। 'বুলি'র বদলে ফ্রী-হিট করিয়ে খেলা শুরুর কথা ভাবা হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, হকিতে কর্ণার দু'ধরনের—শুধু কর্ণার ও পেনাল্টি-কর্ণার। চল্‌তি কথায় এদের যথাক্রমে লং-কর্ণার ও শর্ট-কর্ণার বলা হয়। যদি আত্মরক্ষাকারী দলের কোনও খেলোয়াড় ২৫-গজ (২২.৮৬ মিটার) এলাকার মধ্যে থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বলটি

নিজ গোল-লাইনের উপর দিয়ে পাঠিয়ে দেয় বা মাঠের যে কোনও জায়গা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ কাজ করে তা হলে প্রথম ক্ষেত্রে আম্পায়ার আক্রমণকারী দলের অনুকূলে কর্ণার এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পেনাল্টি-কর্ণারের নির্দেশ দেবেন। অবশ্য যদি আত্মরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড়ের অপরাধের ফলে গোলই হয়ে যায়, তা হলে আর কর্ণার বা পেনাল্টি-কর্ণারের প্রশ্ন উঠবে না। **মনে রাখতে হবে, অপরাধ ইচ্ছাকৃত, না অনিচ্ছাকৃত তা ঠিক করবেন আম্পায়াররা।** যে-কোনও রকমের কর্ণারের ক্ষেত্রেই আক্রমণকারী দলের একজন খেলোয়াড় বল হিট করার পর ঐ দলেরই অপর একজন খেলোয়াড় আগে বলটি থামিয়ে দেবে বা বলটিকে আত্মরক্ষাকারী দলের কোনও খেলোয়াড়ের স্টিক বা শরীর স্পর্শ করাতে হবে—তার আগে বলটিকে হিট করে গোলে পাঠানো যাবে না।

বলটি হাত দিয়ে থামাতে হলে মাটিতে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থায় রাখতে হবে। কর্ণার-হিট নেওয়ার সময় আত্মরক্ষাকারী দলের সব খেলোয়াড় গোল-লাইনের পিছনে থাকবে, আর আক্রমণকারী দলের অন্য খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে অথচ সার্কলের বাইরে থাকবে। বল হিট করার আগে যদি তারা মাঠে (বা সার্কলের মধ্যে) ঢুকে পড়ে তা হলে আম্পায়ার হিটটি পুনরায় নেবার নির্দেশ দেবেন। অবশ্য যদি আত্মরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড়রা বার বার ইচ্ছাকৃতভাবে এই রকম করে, তা হলে আক্রমণকারী দলকে পেনাল্টি-কর্ণার দেওয়া হবে। বল যেদিকের গোল-লাইন অতিক্রম করার ফলে কর্ণারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই দিকের কর্ণার-ফ্ল্যাগ পোস্টের তিন গজের (২.৭৪৩ মিটার) মধ্যে গোল-লাইন বা সাইড-লাইনের উপর থেকে ফ্রী-হিট নিয়ে কর্ণার করতে হবে। **পেনাল্টি-কর্ণারের বেলায় নিয়ম একটু অন্য রকম।** এ-ক্ষেত্রে আত্মরক্ষাকারী দলের গোলের যে কোনও দিকের গোল-লাইনের উপর থেকে ফ্রী-হিট নিতে হবে, অবশ্য গোলপোস্ট থেকে দশ গজ (৯.১৪৪মিটার) ছেড়ে দিয়ে। আর আত্মরক্ষাকারী দলের সর্বাধিক

৬ জন খেলোয়াড় গোল-লাইনের পিছনে থাকতে পারবে, অন্যেরা হিট নেওয়া পর্যন্ত সেণ্টার-লাইনের পিছনে থাকবে। এ-ছাড়া, কর্ণারের মত এ-ক্ষেত্রে আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড়দের দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোনও বিধি-নিষেধ নেই।

এই পর্যন্ত দেখা গেল যে, পেনাল্টি-কর্ণার খুব গুরুদণ্ড। অবশ্য গুরু অপরাধের ক্ষেত্রেই এই গুরুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু যেখানে আম্পায়ার দেখছেন অপরাধ এমন ধরনের যে, পেনাল্টি-কর্ণার দিলেও উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে না, সেখানে তিনি কী করবেন? বলা বাহুল্য, পেনাল্টি-স্ট্রোকের নির্দেশ দেবেন। ফুটবলে যেমন 'পেনাল্টি-কিক' হকিতে তেমনি 'পেনাল্টি-স্ট্রোক'। **'বিভিন্ন অপরাধ'** অংশে যে সমস্ত অপরাধের কথা বলা হয়েছে (৪৯ পৃঃ) গোল বাঁচাবার উদ্দেশ্যে যদি আত্মরক্ষাকারী দলের কোনও খেলোয়াড় সেগুলির কোন একটি ইচ্ছাকৃতভাবে করে তাহলে আম্পায়ার পেনাল্টি-স্ট্রোকের নির্দেশ দেবেন। আবার যদি অনুরূপ কোনও অপরাধ সে অনিচ্ছাকৃতভাবে করে ফেলার ফলে একটি গোল, যা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, তা হল না, তা হলেও আম্পায়ার একই নির্দেশ দেবেন। আম্পায়ার স্ট্রোক নেবার সংকেত করলে গোল-লাইনের ঠিক মাঝখান থেকে ৮ গজ (৭.৩১৫ মিটার) দূরে একটি চিহ্নিত জায়গা থেকে আক্রমণকারী দলের কোনও খেলোয়াড় বলটি বিপক্ষ গোলে ঠেলে দেয় বা 'স্কুপ' করে দেয়। এই সময় আত্মরক্ষাকারী দলের গোলরক্ষক নিজ গোল-লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই সময় উভয় দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা কাছের '২৫-গজ (২২.৮৬ মিটার) লাইনে'র বাইরে দাঁড়াবে। পেনাল্টি-স্ট্রোক থেকে সরাসরি গোল হতে পারে, আবার এই সময় গোলরক্ষকের নিজস্ব কোনও অপরাধের জন্যে যদি গোল বেঁচে যায়, তাহলেও আম্পায়ার গোলের নির্দেশ দিতে পারেন।

দেখা যাচ্ছে যে, আম্পায়ারদের ক্ষমতা প্রচুর। তবে যদি আম্পায়ার দেখেন যে, তিনি দোষী দলকে দণ্ড দিলে সেই দলের বরং

সুবিধাই হচ্ছে, তা হলে সে-ক্ষেত্রে তিনি দণ্ড দেবেন না। ফুটবলেও এই নিয়ম আছে। চল্‌তি কথায় একে 'অ্যাডভাণ্টেজ রুল' বলা হয়। (ইংরেজীতে 'অ্যাডভাণ্টেজ' কথাটির অর্থ 'সুবিধা'।) হয়তো দেখা গেল, বিপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণকে রুখতে না পেরে কোনও খেলোয়াড় তার স্টিকটি ছুটন্ত বিপক্ষ খেলোয়াড়ের দুই পায়ের মধ্যে গলিয়ে দিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটিকে এড়িয়ে আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড়টি বল নিয়ে সার্কলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এই অবস্থায় আত্মরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড়টিকে দণ্ড দিতে গেলে খেলা থামাতে হবে। তার অর্থই হচ্ছে আক্রমণকারী দলের একটি গোলের সুযোগ নষ্ট করা। এর ফলে আত্মরক্ষাকারী দলের সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবে না। তাই আম্পায়ার অপরাধটি উপেক্ষা করবেন যাতে আক্রমণকারী দল গোল করার সুযোগ পায়।

পেনাল্টি-স্ট্রোক সম্পর্কে আর একটি কথা বলেই আমাদের হকি-সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করছি। অমীমাংসিত খেলায় জয়-পরাজয় নির্ধারণ করার জন্যে ফুটবলের মত যে 'টাই-ব্রেকার' প্রথা আজকাল হকিতে চালু হয়েছে, তাতেও উভয় দলকে প্রথমে পাঁচটি করে পেনাল্টি-স্ট্রোক মারতে দেওয়া হয়। এ-ক্ষেত্রে পেনাল্টি-স্ট্রোক কিন্তু কোনও অপরাধের জন্যে দেওয়া হচ্ছে না।

ক্রিকেট

ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয় হলেও অ্যাথ্‌লেটিক্‌স্, হকি, ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতির মত জনপ্রিয় নয়। এর কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলন (ইণ্টারন্যাশন্যাল ক্রিকেট কনফারেন্স)—যা বিশ্বে ক্রিকেট খেলা নিয়ন্ত্রণ করে, তার সদস্য মাত্র ছ'টি দেশ—ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড,

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং পাকিস্তান। ১৯৬১ সালের মে পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা এর সদস্য ছিল, এখন আর নেই। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য খেলার নিয়ম-কানুনের তুলনায় ক্রিকেটের নিয়ম-কানুন বেশ জটিল—যে কারণে ক্রিকেট খেলা দেখে সকলে বুঝতেও পারে না। এ-ছাড়া, ক্রিকেট খেলা দেখতে যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন হয়—যেটা অনেক ব্যক্তিরই নেই।

তবু ক্রিকেট খেলাকে 'খেলার রাজা' বলা হয়। এরকম বলার কারণ ক্রিকেটের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত এবং ফলাফল সম্পর্কে চরম অনিশ্চয়তা। অন্যান্য অনেক খেলার চেয়েই ক্রিকেটে কোনও দল যৌথভাবে এবং কোনও খেলোয়াড় এককভাবে কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ বেশি পায়। তা-ছাড়া ক্রিকেট খেলা মানুষকে ভদ্র, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মনিষ্ঠ হতে শিক্ষা দেয়। সেই জন্যেই ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কোনও কাজ সম্পর্কে বলা হয়, 'দিস ইজ নট ক্রিকেট!'

দলবদ্ধভাবে যে সব খেলা হয় ('টিম গেম') তাদের মধ্যে অনেকগুলির চেয়ে ক্রিকেটের ইতিহাসই পুরাতন। প্রাচীন উপ-জাতিদের একাধিক খেলাকেই অনেকে ক্রিকেটের 'পূর্বপুরুষ' বলে মনে করেন। যদিও ঐ ধরনের বক্তব্যের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও অতি-শয়োক্তি থেকে গেছে, তবু এ-কথা সত্যি, ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলের সুপ্রাচীন কোনও খেলা থেকেই ক্রিকেটের উদ্ভব এবং ২৫০ বছর আগেও প্রায় আজকের মতই ক্রিকেট খেলা হত। ইংল্যাণ্ডের হ্যাম্পশায়ার অঞ্চলের, বিশেষতঃ হ্যাম্বলডন্ গ্রাম, সারে ও কেণ্টের অধিবাসীরাই আজকের ক্রিকেটের উদ্ভাবক।

সুতরাং, ইংল্যাণ্ডই ক্রিকেটের জন্মভূমি। আর ক্রিকেট ইংরেজ-দের জাতীয় খেলা। ইংরেজরাই অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউ-জিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলার প্রসার ঘটায়। ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলা হয় ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ মেলবোর্ণ মাঠে। এটাই পৃথিবীর প্রথম ক্রিকেট টেস্ট।

ক্রিকেট সম্পর্কে একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ফুটবল, হকি ইত্যাদির মত ক্রিকেট খেলার নিয়ম-কানুন তৈরি ও ব্যাখ্যার কোনো বিশ্বসংস্থা নেই। ইংল্যাণ্ডের মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাব (বা সংক্ষেপে এম. সি. সি.) ক্রিকেট আইন যেভাবে তৈরি করেন বা তার যে ব্যাখ্যা করেন সেটাই সারা পৃথিবীতে মেনে নেওয়া হয় এবং আজ পর্যন্ত এই রীতিই চলে আসছে।

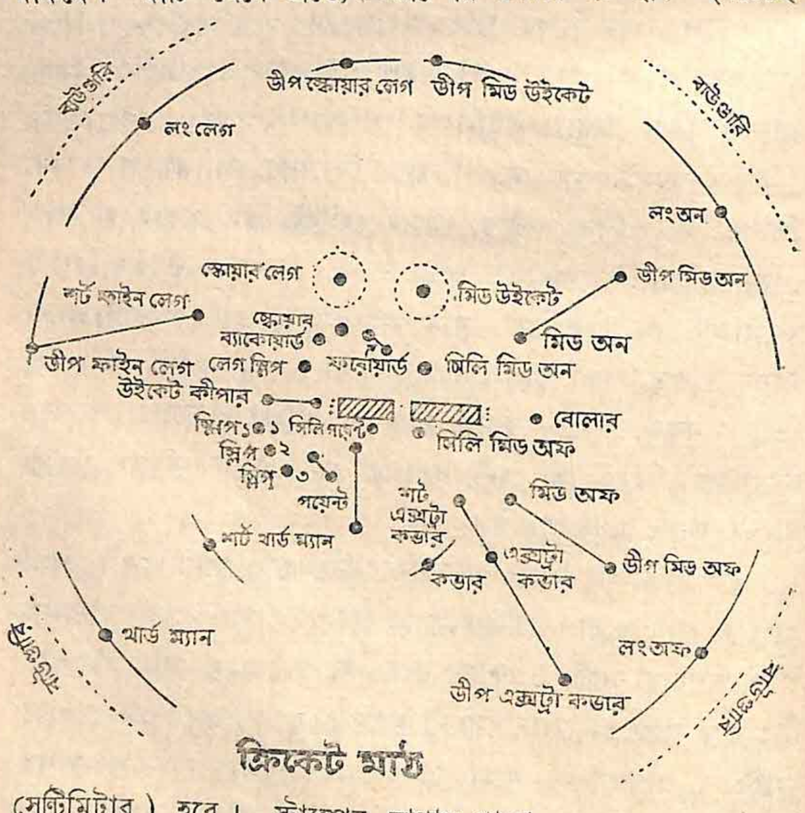
ক্রিকেটে বিভিন্ন দিকে কৃতিত্ব দেখিয়ে বহু খেলোয়াড় বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন—এঁদের সকলের নাম এই অল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও যাঁদের নাম বিশ্বের ক্রিকেট-রসিকদের মুখে মুখে ফেরে তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হল—ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান, লিণ্ডসে হ্যাসেট, কিথ মিলার, উইলিয়াম পোন্সফোর্ড, রেমণ্ড লিণ্ডওয়াল, ক্ল্যারেন্স গ্রিমেট, অ্যালান ডেভিডসন, জি. আর. ল্যাংলী, লেন হাটন, পিটার মে, কলিন কাউড্রে, ট্রেভর বেইলী, জিম লেকার, অ্যালেক বেডসার, গ্যারী সোবার্স, ফ্রাঙ্ক ওরেল, এভারটন উইকস, ক্লাইড ওয়ালকট, রয় গিলক্রিস্ট, সনি রামাধীন, রোহান কানহাই, ল্যান্স গিবস্, রঞ্জিত সিংজী, দলীপ সিংজী, মহম্মদ নিসার, লালা অমরনাথ, ভিনু মানকড়, মনসুর আলি পতৌদি, অজিত ওয়াদেকর, ভাগবৎ চন্দ্রশেখর, বিষেণ সিং বেদী, এরাপল্লী প্রসন্ন, হানিফ মহম্মদ, মুস্তাক মহম্মদ, ফজল মামুদ প্রভৃতি।

এবার ক্রিকেট খেলার প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি জানা যাক। খেলা হয় দু'টি দলের মধ্যে। প্রতি দলে ১১ জন খেলোয়াড় থাকে। দু'দলই পালা অনুযায়ী ব্যাটিং ও ফিল্ডিং করে—অবশ্য খেলার আগে টস্ করে ঠিক করে নিতে হয় কোন্ দল কী করবে। যে দল টসে জেতে সেইদল ব্যাটিং ও ফিল্ডিং-এর মধ্যে সুবিধাজনকটা বেছে নেবার পর অপর দলকে অন্যটা করতে হয়। দু'দলের অধিনায়ককে আম্পায়ার টস্ করতে ডাকবেন। প্রত্যেক দলের একজন অধিনায়ক থাকা বাধ্যতামূলক—এটা ক্রিকেটের আইনেরই কথা। আইনের কথা

ছেড়ে দিলেও ক্রিকেটে অধিনায়কের দায়িত্ব অসীম—বিশেষতঃ যখন অনেক সময় তাঁর সিদ্ধান্তের উপরই দলের ভাগ্য নির্ভর করে।

মাঠের মাঝখানে দু'দিকে উইকেট পোঁতা হয়—পরস্পরের মুখোমুখি ও সমান্তরালভাবে। উভয় দিকের উইকেটে তিনটি করে স্টাম্প থাকে। দু'দিকের স্টাম্পের মধ্যের ব্যবধান ২২ গজ (২০.১৩ মিটার)।

প্রত্যেক উইকেট চওড়ায় ৯ ইঞ্চি (২২.৮৬ সেন্টিমিটার) হবে এবং উইকেটের মাথায় ৪$\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি (১১.১১ সেন্টিমিটার) লম্বা দু'টি বেল থাকবে। মাটি থেকে প্রত্যেক স্টাম্পের উচ্চতা ২৮ ইঞ্চি (৭১.১২

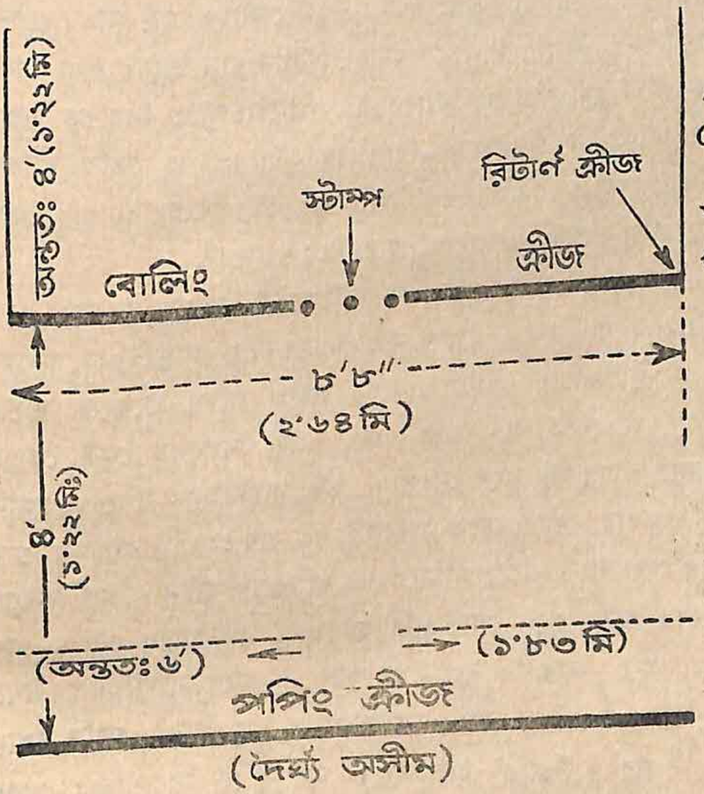


ক্রিকেট মাঠ

সেন্টিমিটার) হবে। স্টাম্পের মাথায় থাকা অবস্থায় বেল স্টাম্প ছাড়িয়ে $\frac{১}{২}$ ইঞ্চির (১.২৭ সেন্টিমিটার) বেশি উঠবে না। ব্যাট ৩৮ ইঞ্চির (৯৬.৫২ সেন্টিমিটার) বেশি লম্বা হবে না এবং ব্যাটের সবচেয়ে চওড়া অংশ ৪$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চির (১০.৮০ সেন্টিমিটার) বেশি হবে না। বলের

পরিধি ৮১৩/১৬ ইঞ্চির (২২.৩৮ সেন্টিমিটার) কম বা ৯ ইঞ্চির (২২.৮৬ সেন্টিমিটার) বেশি হবে না এবং ওজন ৫½ আউন্সের (১৫৫.১২ গ্রাম) কম বা ৫¾ আউন্সের (১৬৩ গ্রাম) বেশি হবে না। স্টাম্পগুলির গঠন সমান এবং উপযুক্ত মাপের হবে, যাতে তাদের মধ্য দিয়ে বল গলে না যায়।

স্টাম্পগুলির লাইনেই ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি (২.৬৪ মিটার) লম্বা 'বোলিং ক্রীজ' হবে ; বোলিং ক্রীজের ঠিক মাঝখানে স্টাম্প থাকবে। স্টাম্পের দু'ধারে উইকেটের পিছনে ঠিক সমকোণে থাকবে 'রিটার্ণ ক্রীজ'।



বিভিন্ন ক্রীজের অবস্থান ও মাপ

বোলিং ক্রীজের ৪ ফুট (১.২২ মিটার) সামনে তার সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে 'পপিং ক্রীজ' টানতে হবে। পপিং ক্রীজ এবং রিটার্ণ ক্রীজ

দু'য়েরই দৈর্ঘ্য অসীম বলে ধরা হয় কিন্তু পপিং ক্রীজকে অন্ততঃ ৬ ফুট (১.৮৩ মিটার) ও রিটার্ণ ক্রীজকে অন্ততঃ ৪ ফুট (১.২২ মিটার) দীর্ঘ হতে হবে। দুই উইকেটের মধ্যস্থলকে যদি কোনও রেখা দিয়ে যুক্ত করা যায় তা হলে সেই রেখার দু'ধারে ৫ ফুট (১.৫২ মিটার) চওড়া যে জায়গা দুই বোলিং ক্রীজের মধ্যে পড়ছে, তাকেই 'পিচ্' বলা হয়। খেলা চলতে চলতে পিচ্ বদলানো যাবে মাত্র একটি ক্ষেত্রেই—যদি সেটা খেলার পক্ষে অযোগ্য প্রতিপন্ন হয় এবং এই একটি ক্ষেত্রেও দুই অধিনায়কের সম্মতি চাই। পিচে রোলার দেওয়া, পিচের ঘাস ছাঁটাই করা এবং পিচে জল দেওয়া—সব ব্যাপারই আইনানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। টসের আগে পর্যন্ত পিচের জায়গা ঠিক করা ও পিচ তৈরির দায়িত্ব মাঠ-কর্তৃপক্ষের। কিন্তু খেলা আরম্ভের পর পিচের ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পূর্ণ আম্পায়ারদের দায়িত্বে থাকবে।

যে দল ব্যাট করবে দু'দিকের উইকেটেই তাদের একজন করে ব্যাটসম্যান দাঁড়াবে। যাকে বল দেওয়া হচ্ছে সে স্ট্রাইকার, অপর-জন নন-স্ট্রাইকার। ব্যাটসম্যানদের লক্ষ্য তাদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া বল মেরে রাণ করা—এবং বলটি বিপক্ষের কেউ ফেরত পাঠাবার আগে রাণ করে নেওয়া। দুই ব্যাটসম্যান পিচের সমান দূরত্ব একবার দৌড়ে যেতে পারলেই এক রাণ হবে। ব্যাটসম্যানের মারের ফলে বলটি মাঠের সীমারেখা (বাউণ্ডারি-লাইন) স্পর্শ করলে বা পার হয়ে গেলে 'বাউণ্ডারি' হয় এবং বাউণ্ডারির জন্য ৪ রাণ দেওয়া হয়। আর যদি বল মাটি স্পর্শ না করে সীমারেখার উপর দিয়ে চলে যায়, তা হলে ব্যাটসম্যান ৬ রাণ পাবে; চল্‌তি কথায় একে 'ওভার বাউণ্ডারি' বলা হয়। বল খুঁজে না পাওয়া গেলে কোন ফিল্ডার 'লস্ট-বল' ডাকতে পারে, তখন ব্যাটিংপক্ষের স্কোরে ৬ রাণ যোগ করা হবে।

বোলার একদিকের উইকেট থেকে অপরদিকের উইকেটে

দাঁড়ানো প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানের দিকে বল দেয়। বোলার ৮ বা ৬ বলের ওভারে বল করে। একই ইনিংসে কেউ পর-পর দুই ওভার বল করতে পারবে না। বোলার-সমেত ফিল্ডিং পক্ষের সকলের উদ্দেশ্য ব্যাটসম্যানদের আউট করা; দশজন ব্যাটসম্যান আউট হলেই একটি দলের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। কারণ, তখন একাদশ ব্যক্তির সঙ্গে খেলবার কেউ থাকে না। একাদশ ব্যক্তি 'নট-আউট' থেকে যায়। অবশ্য ব্যাটিং-পক্ষের অধিনায়ক খেলা চলার মধ্যে যে কোনও সময়েই ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারে।

ব্যাটসম্যান অনেকভাবে আউট হয়ে যেতে পারে। যদি বোলারের দেওয়া বলের আঘাতে উইকেটের বেল পড়ে যায় (তার আগে বল ব্যাটসম্যানের ব্যাট বা দেহ স্পর্শ করুক বা না-ই করুক) তাহলে ব্যাটসম্যান বোল্ড-আউট হবে। (জোরে বাতাস বইলে বেল ছাড়াই খেলা যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে বলটি উইকেটে লাগলেই আউট দেওয়া হবে।) বলটি ব্যাটসম্যান খেলার পর বা ব্যাট-ধরা-হাতে লাগার পর (কব্জিতে লাগলে হবে না) মাটিতে পড়বার আগেই যদি কোনও ফিল্ডার বলটিকে ধরে নেয় বা শরীরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে বা বলটি তার পোশাকের মধ্যে আটকে যায়, ব্যাটসম্যান 'কট্-আউট' হবে। বল খেলতে নিয়ে ব্যাটসম্যান যদি রাণ নেবার চেষ্টা বাদে অন্য রকমে 'আউট অব হিজ গ্রাউণ্ড' হয় অর্থাৎ পপিং ক্রীজ থেকে বেরিয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় অন্য কোনও ফিল্ডসম্যানের হস্তক্ষেপ ছাড়াই উইকেটকীপার উইকেট ভেঙে দেয়, তাহলে ব্যাটসম্যান স্টাম্পড্-আউট হবে। উইকেট ভাঙতে হলে উইকেটকীপার (বা অন্য ক্ষেত্রে, অন্য যে কোনও ফিল্ডার) তার হাত বা বাহু ব্যবহার করতে পারে; এমন কি, বেল দু'টি যদি আগে থেকেই যথাস্থানে না থাকে, একটা স্টাম্প উপড়ে ফেলতে পারে—অবশ্য এই সময় ব্যবহৃত হাতে বা দুই হাতের মধ্যে বলটি রাখতে হবে। বলটি খেলতে গিয়ে ব্যাটসম্যান যদি তার ব্যাট বা দেহের

কোনও অংশ দিয়ে আঘাত করে উইকেটটি ভেঙে ফেলে তা হলে সে 'হিট উইকেট আউট' হবে। রাণ নেবার সময় এ-রকম ঘটলে কিন্তু সে আউট হবে না। অবশ্য বল খেলতে গিয়ে যদি ব্যাটসম্যানের টুপি পড়ে উইকেট ভেঙে যায়, তাহলেও সে আউট হবে। দুই ব্যাটসম্যানের যে কেউ রাণ নেবার সময় বা বলটি খেলার মধ্যে থাকা অবস্থায় (অর্থাৎ যখন বল 'ডেড্' নয়) যদি পাপিং ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং বিপক্ষীয় খেলোয়াড় তার উইকেট ভেঙে দেয়, তাহলে সে রাণ-আউট হবে। **রাণ-আউটের ক্ষেত্রে দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে কোন্ খেলোয়াড়কে রাণ-আউট ধরা হবে?** রাণ করার সময় যদি ব্যাটসম্যানরা পরস্পরকে অতিক্রম বা 'ক্রস' করে যায়, সে ক্ষেত্রে যার সামনের উইকেট ভেঙে দেওয়া হবে, তাকেই আউট বলে ধরা হবে। কিন্তু ব্যাটসম্যানরা ক্রস করার আগেই যদি উইকেট ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে যে উইকেট ভেঙে দেওয়া হল সেই উইকেটটি ছেড়ে যে বেরিয়েছে তাকে আউট বলে ধরা হবে।

আর এক রকমেও ব্যাটসম্যান আউট হতে পারে—'লেগ বিফোর উইকেট' বা সংক্ষেপে 'এল. বি. ডব্লিউ.' হয়ে। ফুটবলে ও হকিতে যেমন অফ্-সাইড নিয়ে নানারকম তর্ক-বিতর্ক, বিভ্রান্তি ও ঝগড়াঝাঁটির সৃষ্টি হয়, ক্রিকেটেও কোন ব্যাটসম্যান সত্যিই 'এল. বি. ডব্লিউ.' ছিল বা ছিল না—এই নিয়ে অনেক সময় অনেক অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং আম্পায়ার, খেলোয়াড়, দর্শক সকলেরই জানা উচিত এল. বি. ডব্লিউ. আউট কখন দেওয়া হয়। ধরা যাক্, উইকেট থেকে উইকেটে সরলরেখা টানা রয়েছে। এই কাল্পনিক রেখার মধ্যে অবস্থান করতে করতে ব্যাটসম্যান হাত ছাড়া দেহের অন্য যে কোনও অংশ (এমন কি সেই অংশটি বেলের উচ্চতা ছাড়িয়ে উপরে থাকলেও) দিয়ে যদি এমন কোনও বল আটকে দেয়, যা (১) তার ব্যাট বা ব্যাট-ধরা-হাত প্রথমে স্পর্শ করেনি, (২) যা আম্পায়ারের মতে কাল্পনিক রেখার উপরে

পড়ত বা পড়বে, বা ব্যাটসম্যানের উইকেটের অফের দিকে পড়বে, এবং (৩) যা উইকেটেই লাগত—তা হলে সে 'লেগ বিফোর উইকেট' আউট হবে। সুতরাং নিম্নলিখিত চারটি প্রশ্নেরই উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তা হলেই ব্যাটসম্যানকে এল. বি. ডব্লিউ. আউট দেওয়া যাবে : (১) বলটি কি উইকেটে লাগত ? (২) বলটি কি উইকেট থেকে উইকেটে টানা কাল্পনিক রেখার মধ্যে ছিল, না সংশ্লিষ্ট ব্যাটসম্যানের উইকেটের অফের দিকে ছিল ? (৩) যাতে প্রথমে বলের গতি রোধ হয় সেটি কি ব্যাটসম্যানের হাত ছাড়া শরীরের অন্য কোনও অংশ ? এবং (৪) যে সময় বলটি ব্যাটসম্যানের শরীরে লাগে তখন সেই অংশটি উইকেট থেকে উইকেটে টানা রেখার মধ্যে ছিল কি ?

এ-ছাড়া যদি ব্যাটসম্যান (ক) ইচ্ছা করে প্রতিপক্ষের ফিল্ডিংয়ের প্রতিবন্ধকতা করে, বা (খ) বলটি খেলার মধ্যে থাকা অবস্থায় হাত দিয়ে বল স্পর্শ করে, বা (গ) বলটিকে মারার বা দেহের কোনও অংশ দিয়ে থামানোর পর সেটিকে একমাত্র নিজের উইকেট বাঁচানোর উদ্দেশ্য ছাড়া আবার ইচ্ছাকৃতভাবে বলটিকে মারে, তাহলে সে যথাক্রমে 'অবস্ট্রাকটিং দি ফিল্ড' বা 'হ্যাণ্ডলিং দি বল' বা 'হিটিং দি বল টোয়াইস্' অপরাধে আউট হবে। এই তিনটি ক্ষেত্রে (ও রাণ-আউটের জন্য) বোলার কৃতিত্ব পাবে না—অর্থাৎ বোলারের উইকেট হবে না। তবে এইসব ধরনের আউট খুব কমই হয়।

একটা কথা মনে রাখবে : **যতক্ষণ না অপর দল আবেদন (অ্যাপীল) করছে, ততক্ষণ আম্পায়ার কোনও ব্যাটসম্যানকে আউট ঘোষণা করবেন না।**

ব্যাটসম্যান হিট করে যে-সব রাণ করে তা ছাড়াও অতিরিক্ত রাণ ('এক্সট্রা') হতে পারে, এই রাণগুলি ব্যাটসম্যানের নামে লেখা হয় না। বলটি ছুঁড়ে ('থ্রো' করে) ছাড়া হলে কিংবা বল ছাড়ার মুহূর্তে বোলারের সামনের পায়ের পাতার কিছু না কিছু অংশ পপিং ক্রীজের পিছনে মাটিতে বা শূন্যে না থাকলে কিংবা বোলারের পিছনের

পা রিটার্ণ ক্রীজের বা তার সম্মুখের দিকের বিস্তৃতির মধ্যে না থাকলে বা ঐ হু'য়ের কোনওটিকে ছুঁয়ে থাকলে আম্পায়ার 'নো-বল' ডাকেন। ব্যাটসম্যান নো-বল মারলে সেইভাবে পাওয়া রাণগুলি তাঁর ব্যক্তিগত রাণসংখ্যার সঙ্গে যোগ হবে; অন্যথায় একটি রাণ নো-বল হিসেবে ধরা হবে। (নো-বলে বোল্ড, কট, স্টাম্পড্, হিট-উইকেট ও এল. বি. ডব্লিউ. আউট ছাড়া বাকী আউটগুলি হতে পারে।) বোলার যদি উইকেটের এত উপর দিয়ে বা এত পাশ দিয়ে বল করে যা ব্যাটসম্যানের নাগালের বাইরে দিয়ে যায় এবং উইকেটে গার্ড নিয়ে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় বলটিকে নাগালে পাওয়া না যায়, তাহলে বলটি ব্যাটসম্যানকে অতিক্রম করা মাত্রই আম্পায়ার **'ওয়াইড-বল'** ডাকেন। নো-বলের মতই এ-ক্ষেত্রেও ব্যাটসম্যান বল মেরে রাণ না নিতে পারলে একটি রাণ এক্সট্রা লেখা হবে। 'ওয়াইড' বা 'নো' ডাকা হয়নি এমন বল যদি ব্যাটসম্যানের ব্যাটের বা দেহের অংশ স্পর্শ না করে উইকেট অতিক্রম করে এবং কোনও রাণ পাওয়া যায়, তা হলে **'বাই'** রাণ হবে। কিন্তু বল যদি তার ব্যাট-ধরা-হাতটি বাদে দেহের বা পোশাকের কোনও অংশ ছোঁয় এবং কোনও রাণ হয় তাহলে **'লেগ বাই'** রাণ হবে।

যে-দল ফিল্ডিং করছে সে-দিকের বোলার এবং উইকেটকীপার ছাড়া আর ৯ জন ফিল্ডার বিভিন্ন অবস্থানে থাকে। কে কোথায় দাঁড়াবে সেটা নির্ভর করে বোলার এবং অধিনায়কের উপর; তারা তাদের সুবিধামত ফিল্ডিং সাজিয়ে নেয়। ফিল্ডারদের অবস্থান বহু রকম হতে পারে—৫৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছবি দেখলেই এটা বোঝা যাবে। এটা আইনের কোনও ব্যাপার নয়। কেবল হু'টি ক্ষেত্রে আইনের প্রশ্ন আসছে। যে ব্যক্তি কারও বদলে ফিল্ডিং করতে নামছে সে কোথায় দাঁড়াতে পারবে সেটা ব্যাটিং-দলের অধিনায়ক বলে দিতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ, বোলার বল ডেলিভারী করার মুহূর্তে পপিং ক্রীজের পিছনে অনসাইড ফিল্ডারের সংখ্যা হু'য়ের বেশি হবে না।

ক্রিকেটে দু'জন আম্পায়ার থাকেন। একজন বোলারের উইকেটের আম্পায়ার, অপর জন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। শেষের আম্পায়ার শুধু হিট-উইকেট, স্টাম্পড্-আউট এবং তাঁর দিকের উইকেটে রাণ-আউটের আবেদনের উত্তর দেবেন, অন্য সব আউট-সংক্রান্ত আবেদনের উত্তর দেবেন বোলারের উইকেটের আম্পায়ার। কোনও ক্ষেত্রে এক আম্পায়ার সিদ্ধান্ত না জানাতে পারলে অপর আম্পায়ারের কাছে আবেদন করতে হবে। তখন তিনি যে সিদ্ধান্ত জানাবেন সেটাই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে।

প্রত্যেক দলকে দু'টি করে ইনিংস খেলতে হয়। 'ক' দলের ব্যাটিং ('খ' দলের ফিল্ডিং), 'খ' দলের ব্যাটিং ('ক' দলের ফিল্ডিং) আবার পর-পর 'ক' দলের ব্যাটিং ও 'খ' দলের ব্যাটিং এইভাবে খেলা হবে। অবশ্য যে দল প্রথমে ব্যাট নিয়ে পাঁচ বা তার বেশি দিনের খেলায় ২০০ রাণে, তিন বা চার দিনের খেলায় ১৫০ রাণে, দু'দিনের খেলায় ১০০ রাণে বা একদিনের খেলায় ৭৫ রাণে এগিয়ে থাকে তারা বিপক্ষকে আবার ব্যাট নিতে বাধ্য করতে পারে। একে 'ফলো-অন' করানো বলা হয়।

যে-পক্ষের মোট রাণ বিপক্ষের দু'টি সম্পূর্ণ ইনিংসে করা মোট রাণের থেকে বেশি হবে সেই পক্ষই খেলায় জয়ী হবে। একদিনের খেলায় খেলা সম্পূর্ণ না হলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে খেলার মীমাংসা হবে। এ ছাড়া, কোনো পক্ষ হার স্বীকার করে নিলেও খেলার মীমাংসা হতে পারে। এ-সব কিছু না হলে খেলাটি অমীমাংসিত গণ্য হবে। মীমাংসা হওয়া খেলার ফলাফলকে '...রাণে জয়' এই-ভাবে বলা হয়। অবশ্য শেষ যে-দল ব্যাট করেছে, সেই দল জয়ী হলে তখনও তাদের যে ক'টি উইকেট পড়তে বাকী ছিল তত উইকেটে জয় হয়েছে বলা হয়। (একদিনের যে-সব খেলায় উভয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলার শেষে যে ফল থাকবে, তার উপর এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।) খেলার মীমাংসা হয়ে যাবার পর কোনও দলকে আর খেলা চালিয়ে যেতে বাধ্য করা যায় না।

ভলিবল

ভলিবলের আবিষ্কারক উইলিয়ম জি. মরগ্যান ১৮৯৫ সালে স্প্রিং-ফিল্ডের (আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস-এ) ওয়াই. এম. সি. এ. জিমন্যাসিয়ামে এই খেলার প্রচলন করেন। আন্তর্জাতিক ভলিবল সংস্থা গঠিত হয় ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে, প্যারিসে। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা শুরু ১৯৪৯ সালে। শুরুতে ছয়বার রাশিয়ার পুরুষ দল বিশ্বশ্রেষ্ঠ হন (১৯৪৯, ১৯৫২, ১৯৬০, ১৯৬২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮)। ১৯৫৬ সালে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া। রাশিয়ার মহিলারা বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হন ১৯৫২, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৭০, ১৯৭৩ সালে। সবচেয়ে বেশি দর্শক (৬০ হাজার) সমাগম হয়েছিল ১৯৫২ সালে।

ছোট একখণ্ড জমি, একটি নেট বা জাল ও একটি বল এবং দুই দলের ৬+৬=১২ জন খেলোয়াড় হলেই ভলিবল খেলা চলে। প্রতি দলে আরও ৬+৬=১২ জন অতিরিক্ত 'খেলোয়াড় রাখা যায়। প্রয়োজনে বদলী হিসাবে এদের নামানো হয়।

ভলিবল কোর্টের মাপ হবে দৈর্ঘ্যে ১৮ মিটার ও প্রস্থে ৯ মিটার। কোর্টটি দু'ভাগে বিভক্ত থাকে। যেখানে নেট টাঙানো হয় তার ঠিক নিচ থেকে যে লাইনটি বিভক্তিকরণের কাজ করে তাকে বলা হয় সেন্টার-লাইন। এই নেটটি চওড়া থাকে ১ মিটার ও লম্বায় ৯.৫০ মিটার। মাটি বা মাঠ থেকে নেটের উচ্চতা ছেলেদের খেলার সময় ২ মিটার ৪৩ সেন্টিমিটার ও মেয়েদের খেলার সময় ২ মিটার করতে হয়।

অন্যান্য খেলার মত ভলিবলের শুরুতেও দুই দলের অধিনায়ক টসের মাধ্যমে স্থির করে কারা কোন্ কোর্ট নেবে বা কারা আগে সার্ভিস করবে।

প্রতিটি দলের ৬ জন খেলোয়াড় কোর্টের মধ্যে দুই সারিতে দাঁড়ায়। পিছনের সারির ডানদিকের খেলোয়াড়ের উপরেই সর্বদা

নেটের উপর দিয়ে বল বিপক্ষ কোর্টে পাঠায়—একেই সার্ভিস বলে। এই সার্ভিসের জন্য প্রতিটি কোর্টের ডানদিকে স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে।

প্রতিটি কোর্টে খেলোয়াড়রা দুই সারিতে (৩+৩) দাঁড়ায়। সামনের সারিতে ডান থেকে বাঁয়ে ২, ৩, ৪ ও পিছনের সারিতে ১, ৬ ও ৫ দাঁড়ায়। স্কোরশীটে এই চক্র বা 'রোটেশন' লেখাতে হয়।

একজন খেলোয়াড় ততক্ষণই সার্ভিস করতে পারে, যতক্ষণ না তার দলের উপর খেলা রেফারীর নির্দেশে ভুল বলে পরিগণিত হয় এবং তারপরেই বিপক্ষ সার্ভিসের অধিকার অর্জন করে। যেমন, সার্ভিসের বল নেটে লাগলে বা নেটের তলা দিয়ে গেলে বিপক্ষ সার্ভিস পাবে। তখন ওই দলের খেলোয়াড়রাও কোর্টের মধ্যে ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরে একটি করে স্থান পরিবর্তন করে নেয়।

কোমরের উপরে শরীরের যে-কোনও অংশ দিয়ে বল মারা যায়, তবে হাত দিয়ে আঘাত করাই শ্রেয়ঃ এবং এতে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যে পাঠানো যায়। একটি দলের বল ঠেকাবার জন্য একাধিক বিপক্ষ খেলোয়াড় নেটের কাছে অবরোধ করতে পারে। এই অবরোধ সহ বা অন্য যে-কোনও সময় বিপক্ষের মারা বল এলে একই দলের তিনজনের বেশি পৃথকভাবে স্পর্শ করতে বা ছুঁতে পারে না। বিপক্ষের সার্ভিস করা বল আবার নির্ভুলভাবে বিপক্ষের কোর্টে ফেরৎ পাঠাতে না পারলে বিপক্ষদল একটি পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এইভাবে ১৫ পয়েন্ট করলে এবং বিপক্ষের ২ পয়েন্ট কম থাকলে, অর্থাৎ ১৫-১৩ পয়েন্ট হলে খেলার নিষ্পত্তি হয় এবং প্রথম দল বিজয়ী হয়। তবে ১৪-১৪ পয়েন্ট হলে খেলা চলতে থাকে এবং ১৬-১৪, ১৭-১৫, ১৮-১৬ বা ১৯-১৭ পয়েন্ট হলেই খেলা শেষ হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক আইনানুসারে জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্যে ৫টি বা ৩টি সেটে খেলা হয়ে থাকে।

বাস্কেটবল

বাস্কেটবল খেলা শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে মেক্সিকোর অ্যাজটেকে। কিন্তু আধুনিক বাস্কেটবল চালু হয়েছে ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে। সেখানকার স্প্রিংফিল্ড ওয়াই. এম. সি. এ. কলেজে এই খেলা প্রবর্তন করেন এ. নেস্মিথ। প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা হয় ১৮৯২ সালের ১১ই মার্চ। এ পর্যন্ত একটি খেলায় খোলা স্টেডিয়ামে সর্বাধিক দর্শক (৭৫,০০০) সমাগম হয় ১৯৫১ সালে পশ্চিম বার্লিনের ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে। ইনডোর স্টেডিয়ামে সর্বাধিক দর্শক (৫২,৬৯৩) আসেন হিউসটনের (আমেরিকা) অ্যাস্টোরডোমে ১৯৬৮ সালের ২০শে জানুয়ারি।

ওলিম্পিক বাস্কেটবল শুরু ১৯৩৬ সালে বার্লিনে। যুক্তরাষ্ট্রই ছিল সেবার চ্যাম্পিয়ান। বলা বাহুল্য এ পর্যন্ত তারাই সর্বাধিকবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে। বাস্কেটবলে স্কোর করার সুযোগ বেশি লম্বা খেলোয়াড়দের। ছেলেদের মধ্যে এ পর্যন্ত সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড় দেখা গিয়েছে রাশিয়ায়। তিনি ৭ ফুট ৭.৩ ইঞ্চি (২.৩২ মিটার) লম্বা কাজস্তানের ভ্যাসিলি আখতায়েভ (জন্ম ১৯৩৫)। ওই মাপ নেওয়া হয় ১৯৫৬ সালের রুশ জাতীয় প্রতিযোগিতার সময়। মেয়েদের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী খেলোয়াড়ও রাশিয়ায়। নাম উলায়ানা সেমিয়েনোভা (জন্ম ১৯৫০)। তিনি টি টি টি রিগার পক্ষে রুশ জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

দীর্ঘক্ষণ বাস্কেটবল খেলা হয়েছিল ১৯৭০ সালে ইংলণ্ডের প্রেনটন-এ। হাটন গ্রামার স্কুলের ২৪টি ছাত্র ১০০ ঘণ্টা খেলে একনাগাড়ে। খেলা শুরু করে ৭ই জুলাই সকাল ১১টায় ও শেষ হয় ১১ই জুলাই বিকাল ৩টায়।

প্রতি দলে পাঁচজন করে খেলোয়াড় নিয়ে দুই দলের মধ্যে বাস্কেট-বল খেলা হয়। প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকে বল হাত দিয়ে ছুঁড়ে বাস্কেটে

প্রবেশ করানো -- বিপক্ষ তখন চেষ্টা করে কীভাবে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করবে। এই খেলায় বল পাস, ছোঁড়া, ধাপানো বা ড্রিবল্ করা যায়।

আয়তক্ষেত্রাকার বাস্কেটবল কোর্টের দৈর্ঘ্য ২৬ মিটার ও প্রস্থ ১৪ মিটার। এর কেন্দ্রস্থলে ১.৮০ মিটার ব্যাসার্ধের যে বৃত্তটি থাকে, তাকে সেণ্টার-সার্কল বলে। সেণ্টার-সার্কলের কেন্দ্রবিন্দু বরাবর উভয় দিকে সাইড-লাইনের সমান্তরাল ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ও ৫ সেন্টিমিটার প্রস্থের সেণ্টার-পয়েণ্ট আঁকা হয়। এণ্ড-লাইন থেকে কোর্টের ৫.৮০ মিটার ভিতরে মাঝামাঝি স্থানে ফ্রী থ্রো-লাইন থাকে। এর দৈর্ঘ্য ৩.৬০ মিটার।

কোর্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সংরক্ষিত এলাকা। ফ্রী থ্রো-লাইনের দুই শেষ বিন্দু থেকে এণ্ড-লাইনে ৬ মিটার সমান্তরাল রেখার যে জমি, তাকেই সংরক্ষিত এলাকা বলে।

ব্যাকবোর্ড, বাস্কেট ও বল ঃ বাস্কেট যে বোর্ডের উপর বসানো হয় সেই বোর্ড অবশ্যই ৩ সেন্টিমিটার পুরু কাঠের হওয়া প্রয়োজন।



বাস্কেটে বল ঢুকছে

ব্যাকবোর্ডের সামনের দিকটা চ্যাপ্টা ও সমান হবে এবং স্বচ্ছ অথবা সাদা থাকবে। বোর্ডের মাপ ১.৮০ মিটার × ১.২০ মিটার।

বাস্কেটের জাল সাদা সুতোর হয়। লোহার রিং-এর ভিতরে আটকানো জাল নিচের দিকে ঝোলানো থাকে। রিং-এর ব্যাস ৪৫ সেন্টিমিটার।

বলের পরিধি কখনোই ৭৬ সেন্টিমিটারের কম ও ৭৮ সেন্টিমিটারের বেশি হবে না। আর ওজন থাকবে ৬০০ গ্রাম থেকে ৬৫৮ গ্রামের মধ্যে।

যাঁরা খেলা পরিচালনা করবেন : এই খেলা পরিচালনার জন্য দরকার একজন রেফারী ও একজন আম্পায়ার। আম্পায়ারকে সাহায্যের জন্য চাই একজন টাইমকীপার, একজন স্কোরার ও একজন ৩০-সেকেণ্ড অপারেটর।

দল : প্রত্যেক দলে পাঁচজন করে খেলে। এদেরই একজন হয় অধিনায়ক। অধিনায়ক সতীর্থদের নির্দেশ দেয় তাদের খেলা কীভাবে চলবে। প্রত্যেক দল সাতজন করে বদলী খেলোয়াড় নামাতে পারে। বদলী খেলোয়াড় দেরিতে মাঠে এলেও স্কোরশীটে নাম লেখানো থাকলে যে কোনও সময় সে খেলায় নামতে পারে।

কোচকে অবশ্যই খেলোয়াড় বা কোচের বিশেষ পোশাক পরতে হয়, যাতে সহজেই তাঁকে দেখে বোঝা যায় তিনি দলেরই কেউ।

প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পোশাকের সম্মুখে ও পিছনে নম্বর লেখা থাকে। তবে একই দলের একাধিক খেলোয়াড় যেন একই নম্বর না লাগায়। খেলা চলাকালে কেউ নম্বর বদলালে সে যেন স্কোরার ও রেফারীকে তা জানায়। খেলোয়াড় বদলের দায়িত্ব থাকে কোচের উপর।

গোল : বল বাস্কেটের উপরের দিক থেকে বাস্কেটের মধ্যে ঢুকে আটকে থাকলে বা গলে গেলে গোল হয়। সরাসরি গোল হলে দু' পয়েন্ট যোগ হয়। আর ফ্রী-থ্রো থেকে হলে এক পয়েন্ট।

নির্দিষ্ট সময়ে দুই দলের মধ্যে যারা বেশি পয়েন্ট পায় তারাই জয়ী হয়। রেফারীর নির্দেশ যারা মানে না রেফারীর সিদ্ধান্ত তাদের বিরুদ্ধে যায় এবং তিনি প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট দলকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারেন।

খেলা চলে ২০+২০=৪০ মিনিট। মাঝে ১০ মিনিট বিরতি। তবে পয়েন্ট সমান সমান হলে ৫ মিনিট করে অতিরিক্ত সময় খেলানো হয় টাই ভাঙা পর্যন্ত।

ফাউল : বাস্কেটবলে দু'রকম ফাউল থাকে। যথা : টেকনিক্যাল ও পার্সোনাল।

টেকনিক্যাল ফাউল—কোনও খেলোয়াড় ম্যাচ-পরিচালকদের অসম্মান করে কথা বললে, অশোভন আচরণ করলে বা বাধা দিলে; কিংবা বিপক্ষ খেলোয়াড়ের চোখের সামনে হাত নেড়ে বাধা সৃষ্টি করলে টেকনিক্যাল ফাউল হয়।

পার্সোনাল ফাউল—কোনও খেলোয়াড় বল ধরে রাখলে, বিপক্ষের আগুয়ান কাউকে ধাক্কা দিলে, পা আটকে রাখলে বা বলপ্রয়োগ করে খেললে পার্সোনাল ফাউল হয়।

যে খেলোয়াড় পাঁচটি ফাউল করে—তা টেকনিক্যাল বা পার্সোনাল যা-ই হোক, তাকে স্বেচ্ছায় কোর্টের বাইরে চলে যেতে হবে। তাকে আর সেদিন খেলতে দেওয়া হয় না।

আরও জরুরী কিছু বিধি-নিষেধ : গেম-ওয়াচ (ঘড়ি) তখনই চালু হবে, যখন শুরু, বিরতি বা অতিরিক্ত সময়ে টস্ করা কালে বল সবচাইতে উঁচুতে পৌঁছবার পর কোনও খেলোয়াড় তাতে টোকা মারে।

বল কখন খেলার মধ্যে : টসের সময় বা অন্য কোনও সময় প্রথম খেলোয়াড় যখন লাফিয়ে উঠে বলে টোকা মারে; পরিচালকরা যখন বল ফ্রী-থ্রোয়ারের হাতে দেন ও বাউণ্ডারি থেকে থ্রো-র পর যখন বল কোর্টের ভিতরকার কোনও খেলোয়াড় স্পর্শ করে।

বল কখন 'ডেড্' : গোল হলে; কোচের টেকনিক্যাল ফাউলের ফলে যদি ফ্রী-থ্রো হয়; একটি থ্রো-র পরে যদি ফ্রী থ্রো হয়; বা খেলা চলাকালে যদি পরিচালকদের বাঁশী বাজে।

গেম-ওয়াচ প্রতি অর্ধ খেলা শেষে বন্ধ করে বা থামিয়ে দিতে হয়।

কবাডি

হা-ডু-ডু-রই আধুনিক রূপ কবাডি। মেয়ে এবং ১৬ বছরের কম বয়সের ছেলেদের জন্য কবাডি কোর্টের বা মাঠের জন্য লাগে—১১ মিটার দৈর্ঘ্যের ও ৮ মিটার প্রস্থের জমি। আড়াআড়িভাবে দ্বিখণ্ডিত করার পর প্রতি কোর্টের আয়তন হয় ৫.৫ মিটার×৮ মিটার। লাইনগুলি চুন দিয়ে ৫ সেন্টিমিটার মোটা করে টানতে হয়। পর-পৃষ্ঠার চিত্র লক্ষ্য কর। ক খ, খ গ, গ ঘ ও ঘ ক বাউণ্ডারি-লাইন। এই ক খ ও ঘ গ বাউণ্ডারি-লাইন বরাবর এক মিটার দূরে দু'টি লাইন টানতে হয়। একে 'লবি' বলা হয়।

মধ্যবর্তী লাইনের দু'দিকে ২.৫ মিটার দূরে উভয় কোর্টে 'বক' লাইন টানা হয়।

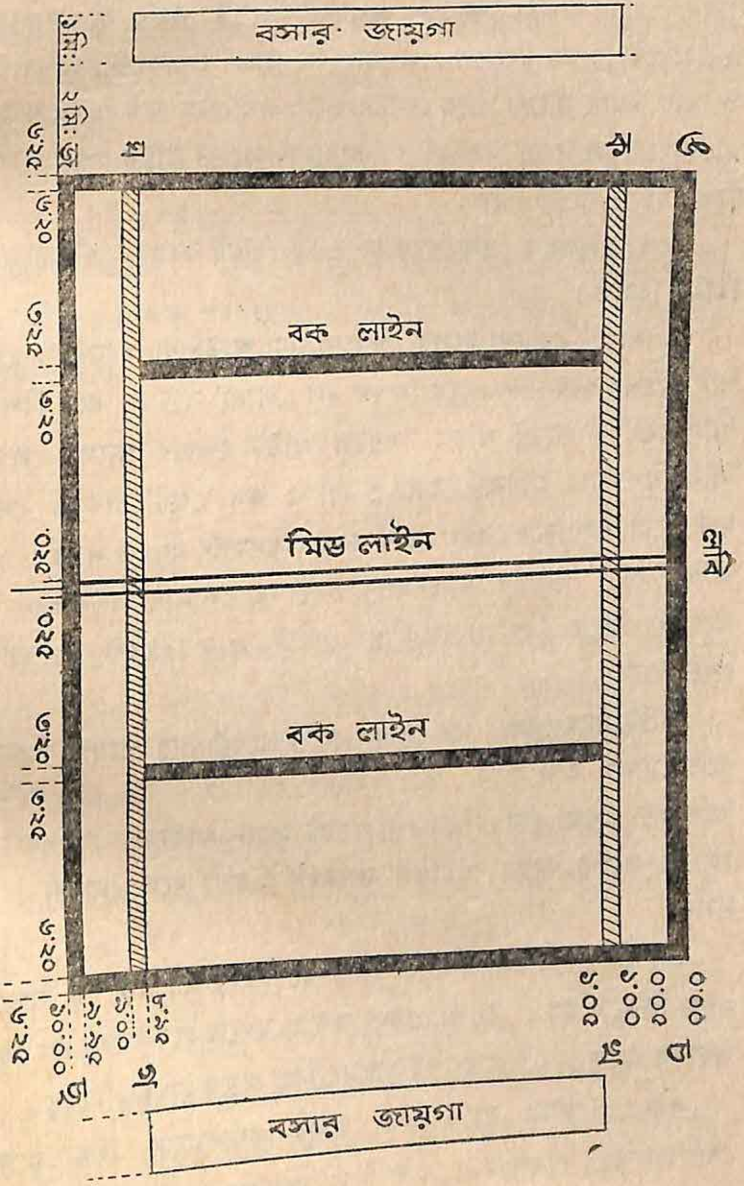
দল : প্রতি দলে ৭ জন খেলোয়াড় ছাড়াও ৫ জন অতিরিক্ত থাকে। প্রয়োজনে এই ৫ জনের ভিতর থেকে ৩ জনকে বদলী হিসাবে নামানো যায়।

খেলা : দু'দলের অধিনায়ক টসের মাধ্যমে খেলা শুরু করে। বিজয়ী অধিনায়ক পছন্দমত কোর্ট বেছে নেয় ও প্রথম হানা দেয়।

প্রতি দলের একজন খেলোয়াড় মধ্যবর্তী বা দ্বিখণ্ডীকরণ লাইন থেকে 'কবাডি' 'কবাডি' শব্দ করতে করতে বিপক্ষের কোর্টে প্রবেশ করে। যতক্ষণ তার দম থাকে, ততক্ষণ সে ওই কোর্টে থাকতে পারে। নিজ কোর্টে ফেরার সময় ওই একই দমে মধ্যবর্তী লাইন পর্যন্ত পৌঁছতে হয়। যে খেলোয়াড় 'কবাডি' 'কবাডি' শব্দে অন্যের কোর্টে যায়, তাকে হানাদার বা 'রেডার' বলে। যে বা যারা তাকে ধরে, তাদের বলা হয় হানাদার-বিপক্ষ বা 'অ্যান্টি'।

হানাদার যদি বিরোধী কোর্টে গিয়ে এক বা একাধিক খেলোয়াড়ের দেহের যে কোনও অংশ স্পর্শ করে তবে তারা আউট হয় বা 'মরে' যায়। যে ওদের স্পর্শ করে তার দলের পক্ষে পয়েন্ট হয় মাথা-

পিছু এক করে। হানাদারকে যদি বিপক্ষ নিজের কোর্টে ধরে রাখে তবে সেই বিপক্ষ একটি পয়েন্ট পায়। প্রত্যেক হানাদার বিপক্ষ কোর্টে



কবাডি খেলার মাঠ

গিয়ে অবশ্যই বক লাইন বা কোল চড়াই স্পর্শ করবে তা না হলে বিপক্ষ পয়েন্ট পাবে। আর ওই সময় বিপক্ষ তাদের পিছনের লাইন স্পর্শ করলে আউট হবে ও পয়েন্ট পাবে হানাদাররা। হানাদারকে বিপক্ষ ধরলেও সে যদি দম থাকতে থাকতে মিড লাইন বা মাঝ চড়াই ছুঁতে পারে কোনওক্রমে তবে বেঁচে যায় ও যে ক'জন তাকে ধরেছিল তারা 'মর' হয়। হানাদার সাইড লাইন স্পর্শ করলে কিন্তু বিপক্ষ পয়েন্ট পায়।

খেলার সময়ঃ দুই অর্ধে ১৫+১৫ মিনিট করে। এর মাঝে ৫ মিনিট বিরতি।

লোনাঃ কোনো দলের খেলোয়াড়রা আউট বা 'মরতে' 'মরতে' যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে বিপক্ষ দল 'লোনা' পায়। এতে বিপক্ষ অতিরিক্ত ২টি পয়েন্ট পায়। সকলে আউট হওয়ার আগেও লোনা পায় বিপক্ষ। যেমন, কোর্টে ১ বা ২ জন 'বেঁচে' থাকতে সেই দল পুরো দল নিয়ে খেলা শুরুর জন্য আত্মসমর্পণ করতে পারে। যে ক'জন 'বেঁচে' থাকতে আত্মসমর্পণ করা হয়, লোনার অতিরিক্ত ২ পয়েন্টের সঙ্গে খেলোয়াড়-পিছু একটি করে পয়েন্ট প্রতিপক্ষ পেয়ে থাকে।

নির্দিষ্ট সময় খেলার পর যে দল বেশি পয়েন্ট পায় তাদেরই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। তবে সমান পয়েন্ট হলে ৫+৫=১০ মিনিট অতিরিক্ত খেলা হবে। তখনও পয়েন্ট সমান থাকলে যারা খেলার শুরুতে পয়েন্ট অর্জন করেছিল তাদেরই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা রীতি।

প্রতিটি খেলোয়াড়ের পোশাকের বুকে ও পিঠে বড় বড় অক্ষরে নম্বর লিখতে হয়। খেলা শুরুর আগে দেখতে হবে কারও নখ যেন লম্বা না থাকে। তেল বা ওই ধরনের কিছু গায়ে মাখাও নিষেধ।

দণ্ডঃ খেলার মাঝে এক দলের খেলোয়াড় অন্য দলের খেলোয়াড়ের (হানাদার) মুখ আটকে রেখে দম ('কবাডি' 'কবাডি')

বন্ধ করতে পারে না ; ছুঁতে গিয়ে বা ধরে আহত করা যায় না ; ৫ সেকেণ্ডের বেশি সময় নেওয়া যায় না হানাদার পাঠাতে ; কোর্টের বাইরে থেকে কোচিং করা বা নির্দেশ দেওয়া নিষিদ্ধ। এসব কারণে দণ্ড ভোগ করতে হয়। দল বাতিল হতে পারে, বিপক্ষ পয়েন্টও পেতে পারে।

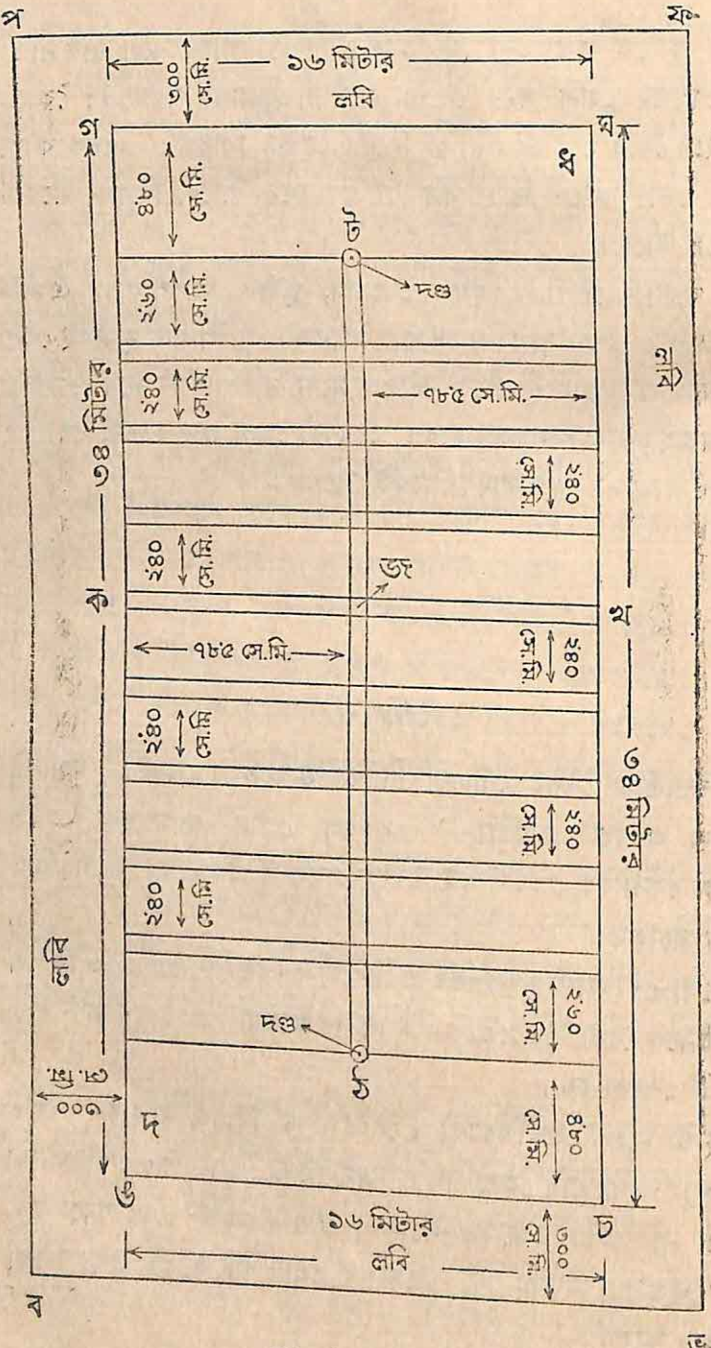
কবাডি খেলায় একজন রেফারী, দু'জন আম্পায়ার, একজন স্কোরার ও দু'জন সহকারী স্কোরার থাকেন। আম্পায়ার দু'জনই খেলা পরিচালনা করেন। তবে তাঁদের মধ্যে মত-পার্থক্য হলে রেফারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। রেফারী খেলা শুরু করেন, সমাপ্তির বাঁশীও বাজান। স্কোরাররা পয়েন্ট লেখেন।

খো-খো

ভারতীয় খেলা খো-খো পশ্চিম-ভারতে বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ফুটবল যেমন আমাদের প্রতি পাড়ায় খেলা হয়, তেমনি ওই অঞ্চলে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে এই খেলা প্রচলিত।

খো-খো মাঠের আয়তন ঃ দৈর্ঘ্যে ৩৪ মিটার, প্রস্থে ১৬ মিটার দু'টি প্রান্তে দৈর্ঘ্য ১৬ × প্রস্থ ৪.৮ মিটার জায়গা বাদ রেখে দু'টি দণ্ড বা খুঁটি পোতা হয়।

দু'টি দণ্ডের সংযোগকারী (দৈর্ঘ্য ২৪.৪ মিটার, প্রস্থ ৩০ সেন্টি-মিটার) পথের নাম কেন্দ্র-পথ। এই পথের উপরে ৩০ সেন্টিমিটার মাপের ৮টি ছোট বর্গক্ষেত্র থাকে। আবার কেন্দ্র-পথের সমকোণে সমান দুইভাবে বিভক্ত ৮টি এড়োপথ ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর দিয়ে অতিক্রম করে।



খো-খো খেলার মাঠ

খো-খো-তে একটি দলকে ধাবক ও আর একটি দলকে অনুধাবক বলে। উভয় দলে ৯ জন করে খেলোয়াড় থাকে। ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর যারা বসে থাকে, তাদের অনুধাবক বলা হয়। এ-ছাড়া এই দলের পিছনে যারা ছুটে বেড়ায় তাদের ছোঁয়ার জন্য, তাদের বলে সক্রিয় অনুধাবক। যাদের পিছনে বা যাদের লক্ষ্য করে দৌড়ানো হয় তাদের ধাবক বলে।

টসে জয়ের পর বিজয়ী অধিনায়ক জানায় তারা ধাবক বা অনুধাবকের কোন্‌টি হতে চায়। অনুধাবকরা ৮ জন ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে বসে। খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় অনুধাবক বিপক্ষ খেলোয়াড়দের ছোঁয়ার চেষ্টা করে এবং সে না পারলে নিজদলের একজনকে স্পর্শ করে ও সেই মুহূর্তে জোরে 'খো' শব্দ করে। 'খো' পাওয়া খেলোয়াড় উঠে পড়লে 'খো' দেওয়া খেলোয়াড় সেই জায়গায় বসে।

খেলার আগে ধাবক দল (৩×৩=৯) তিনটি উপদলে বিভক্ত হয় এবং একসঙ্গে ৩ জন করে মাঠে নামে। সক্রিয় অনুধাবকরা ৩ জনকে ছুঁয়ে 'মর' বা 'আউট' করলে আর একটি উপদল মাঠে নামে।

খো-খো-তে ৭ মিনিট করে একটি 'আবর্ত' হয়। দু'টি আবর্ত নিয়ে একটি ইনিংস হয়। চারটি আবর্ত বা দু' ইনিংস খেলা চলে।



খো-খো খেলায় ধাবক ও অনুধাবক

অনুধাবক দল যতজন ধাবককে 'মর' বা আউট করে, প্রথম দলের

তত পয়েন্ট হয়। আবর্ত শেষ বা ৭ মিনিটের আগে যদি সকলে 'মর' হয়, তবে তাকে বলে 'লোনা'। 'লোনা' অর্থাৎ বিশেষ কৃতিত্ব। এর জন্য কিন্তু অতিরিক্ত পয়েন্ট পাওয়া যায় না।

নক-আউট পদ্ধতির খেলায় যারা বেশি পয়েন্ট পায়, রেফারী তাদের বিজয়ী ঘোষণা করেন। সমান পয়েন্ট হলে অতিরিক্ত একটি পর্যায় খেলা হয়। তখনও নিষ্পত্তি না হলে নতুন করে খেলতে হবে। আবার কোনও দল ১২ বা তার চাইতে বেশি পয়েন্ট পেলে বিপক্ষকে 'ফলো-অন' বা ক্রিকেটের মত উপর্যুপরি আর একটি পর্যায় খেলতে বাধ্য করে। হকি বা ফুটবলে লাইন্সম্যান থাকেন দু'দিকে, তেমনি খো-খো মাঠের দু'পাশে দু'জন আম্পায়ার খেলা পরিচালনা করেন।

সফ্‌ট্‌বল

আমেরিকায় ক্রিকেট খেলার প্রচলন নেই। যদিও আমেরিকানরা স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে, যে কোনও কারণেই হোক তারা ক্রিকেটকে নিতে পারেনি। কিন্তু ক্রিকেটকে নিতে না পারলেও তারা ক্রিকেটকে নিজেদের মত করে বদলে নিয়ে নতুন একটি খেলার সৃষ্টি করেছে, যার নাম বেসবল। আমেরিকায় বেসবল ক্রমশঃ জনপ্রিয় হতে হতে সেখানকার জাতীয় খেলার স্থান লাভ করেছে। এই বেসবল খেলারই সামান্য পরিবর্তিত রূপ সফ্‌ট্‌বল খেলা। সফ্‌ট্‌বল খেলাও আমেরিকায় জনপ্রিয় এবং সেখানে মেয়েরাও এই খেলা খেলে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে আমেরিকার ও কানাডার সৈন্যরা সফ্‌ট্‌বল খেলা চালু করে।

সফ্‌ট্‌বল খেলার বল যে নরম (সফ্‌ট্‌), তা নয়। তবে এই বল বেসবলের বল থেকে আকারে একটু বড়। আর এই খেলায় **'পিচার'**

(ক্রিকেটের বোলারের মত) আণ্ডারহ্যাণ্ড বল দেন, যেটা বেসবলে হয় না। এ-ছাড়া এ খেলায় এক 'বেস' থেকে আর এক 'বেসের' দূরত্ব এবং ব্যাটারের প্লেট বা দাঁড়াবার জায়গা থেকে পিচারের 'প্লেট' পর্যন্ত দূরত্ব বেসবলের চেয়ে কিছুটা কম। নিচে সফ্‌ট্‌বল খেলার মূল নিয়মগুলি দেওয়া হল।

সফ্‌ট্‌বল খেলা হয় দু'টি দলের মধ্যে। প্রতি দলে ৯ জন করে খেলোয়াড় থাকে—পিচার, ক্যাচার, ফার্স্ট বেসম্যান, সেকেণ্ড ম্যান, থার্ড বেসম্যান, সর্ট স্টপ, লেফ্‌ট ফিল্ডার, সেণ্টার ফিল্ডার এবং রাইট ফিল্ডার। প্রতি দলে সব সময়েই ৯ জন খেলোয়াড় থাকতে হবে—৯ জন খেলোয়াড় না থাকলে কোনও দল খেলা শুরু করতে বা চালিয়ে যেতে পারবে না। অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে কোনও সময়েই খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমানো (বা বাড়ানো) চলবে না। তবে ক্ষেত্রবিশেষে আম্পায়ারের মত নিয়ে খেলোয়াড় বদল করা যায়। উভয় দলকেই পালা করে ব্যাটিং ও ফিল্ডিং করতে হয়। কোন্ দল সর্বপ্রথম ব্যাট করবে সেটা সাধারণতঃ 'টস্' করেই ঠিক করা হয়। সফ্‌ট্‌বলে পাঁচটি ইনিংস খেলা হয়। তবে পাঁচ ইনিংস খেলার পর যদি দু'দলের রাণসংখ্যা সমান ('টাই') হয়, তবে জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত এক বা একাধিক ইনিংস খেলানোর ব্যবস্থা আছে। যে দল বেশি রাণ করে, সেই দলই জয়ী হয়। তিনজন আউট না হওয়া পর্যন্ত একটি দল ব্যাট করে। তৃতীয় আউটের সঙ্গে সঙ্গেই দলের একটি ইনিংস শেষ হয়ে যায় এবং ঠিক এই অবস্থা থেকে পরের ইনিংস শুরু হয়।

সফ্‌ট্‌বল খেলার মাঠকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—মাঠের মূল অংশ বা 'ইনফিল্ড' এবং বাইরের অংশ বা 'আউটফিল্ড'। মূল অংশটি রুইতন বা 'ডায়মণ্ড' আকৃতি বলে সফ্‌ট্‌বল মাঠকে 'সফ্‌ট্‌বল ডায়মণ্ড' বলা হয়। এই ডায়মণ্ডের চারটি কোণে চারটি 'বেস' থাকে। এক বেসের সঙ্গে আর এক বেস 'বেস-লাইন' দিয়ে

যুক্ত। এই বেস-লাইনের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এক বেস থেকে আর এক বেসের দূরত্ব ৬০ ফুট (১৮.৩ মিটার)। ডায়মণ্ডের মধ্যে যে জায়গা থেকে পিচার বল ছুঁড়ে দেয়, তাকে বলা হয় 'পিচার্স প্লেট'। এটি ২ ফুট (৬১ সেন্টিমিটার) লম্বা এবং ৬.ইঞ্চি (১৫.২ সেন্টিমিটার) চওড়া একটি পাতলা কাঠের বা রাবারের পাত। বল ছুঁড়ে দেওয়া হয় ব্যাটারের (ব্যাটসম্যানের) উদ্দেশ্যে। ব্যাটার দাঁড়ায় একটি 'বেসে', যাকে বলা হয় 'হোম'। ব্যাটারের দাঁড়ানোর জায়গাটিকে বলা হয় 'হোম প্লেট'। এটি রাবারের তৈরি। পিচার্স প্লেট থেকে হোম প্লেটের দূরত্ব ৪৬ ফুট (১৪.০১ মিটার); মেয়েদের বেলায় এই দূরত্ব আরও কম, ৪০ ফুট (১২.১৮ মিটার)। ডান হাতের ব্যাটারের ডান দিকের বেসটি ফার্স্ট বেস, একেবারে বিপরীত দিকে সেকেণ্ড বেস এবং বাঁ দিকের বেসটি থার্ড বেস। হোম প্লেট, ফার্স্ট বেস ও থার্ড বেস ডায়মণ্ডের সম্পূর্ণ ভিতরে। হোম প্লেট থেকে ফার্স্ট বেস এবং থার্ড বেস পর্যন্ত বেস-লাইনগুলি বেস ছাড়িয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, এগুলিকে বলা হয় 'ফাউল লাইন'। হোম প্লেটের ঠিক পিছনেই ডায়মণ্ডের বাইরে 'ক্যাচারে'র জায়গা বা 'ক্যাচার্স বক্স'। (ক্যাচারের কাজ কিছুটা ক্রিকেটের উইকেট-কীপারের মত।) এ ছাড়া কোচেস বক্সও থাকে।

সফ্‌ট্‌বল খেলার ব্যাট মজবুত কাঠের তৈরি এবং দেখতে অনেকটা ব্যায়াম করার মুগুরের মত। খেলার আইন অনুসারে ব্যাট ৩৪ ইঞ্চির (৮৬.৩৬ সেন্টিমিটার) বেশি লম্বা হতে পারবে না এবং এর সবচেয়ে চওড়া জায়গাটির ব্যাস ২½ ইঞ্চির (৬.৩৫ সেন্টিমিটার) বেশি হতে পারবে না। বলের পরিধি ১১½ ইঞ্চির (২৯.২১ সেন্টিমিটার) কম বা ১১¾ ইঞ্চির (২৯.৮৪ সেন্টিমিটার) বেশি হবে না এবং ওজন ৬ আউন্সের (১৭০ গ্রাম) কম বা ৬½ আউন্সের (১৮৪ গ্রাম) বেশি হবে না।

ব্যাটার্স বক্সে ব্যাটার দাঁড়ানোর পর পিচার বল ছুঁড়ে দেবে। বল

যদি মাটি ছোঁয়ার আগে ব্যাটারের কাঁধ এবং হাঁটুর মাঝের যে কোনও জায়গা দিয়ে হোম প্লেটের উপর দিয়ে চলে যায়, তা হলে 'স্ট্রাইক' হয়—তৃতীয় স্ট্রাইকটি ক্যাচার ধরে ফেললেই ব্যাটার আউট হয়ে যায়।

(বলা বাহুল্য, ব্যাটার বলে না ব্যাট চালালে স্ট্রাইক হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।) কিন্তু ঐভাবে ঐ জায়গা দিয়ে বল না গেলেও স্ট্রাইক হবে, যদি ব্যাটার ব্যাট চালায়, আর তা না হলে আম্পায়ার 'বল' ডাকবেন। বল আইনসম্মতভাবে পিচ করা না হলেও 'বল' ডাকা হয়।

প্রথম ক্ষেত্রে ব্যাটার এগিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু তাকে আউট করা যাবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চারবার 'বল' ডাকা হলেই ব্যাটার এক বেস এগিয়ে যেতে পারবে, অর্থাৎ ফার্স্ট বেসে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন সে বেস-রাণার। দলের ইনিংসের তৃতীয় আউট হবার আগে যদি বেস-রাণার আইনসম্মতভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বেস ও হোম প্লেট ছুঁতে পারে তা হলেই একটি রাণ হবে। তবে খেলোয়াড়দের তালিকায় যার নাম আগে আছে, সেই বেস-রাণার যতক্ষণ না রাণ করছে, ততক্ষণ তার পরের ব্যক্তি রাণ করতে পারবে না।

একই বেসে একসঙ্গে দু'জন বেস-রাণার দাঁড়াতে পারবে না। বেসে অন্য বেস-রাণার এসে গেলে পূর্ববর্তী বেস-রাণার বেস খালি করে পরের বেসে এগিয়ে যাবে। এই সময় তাকে আউট করা যাবে না।

ব্যাটার ও বেস-রাণারদের বহুভাবেই আউট করা যায়। ব্যাটার ফাউল অঞ্চলে বল পাঠালে যদি সেই বল ফিল্ডার ধরে ফেলে, তাহলে ব্যাটার আউট হবে। আবার ব্যাটার বেস-লাইন ধরে যে বেস লক্ষ্য করে ছুটছে, বলের আগে সেখানে পৌঁছাতে না পারলেও সে আউট হবে। বেস-লাইনে একাধিক বেস-রাণার আছে, এমন অবস্থায় যদি বলটি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যায়

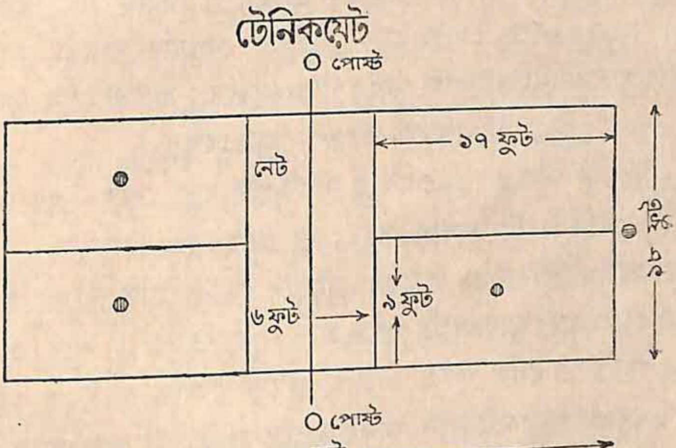
তাহলে একই সঙ্গে দুই বা তিনজনও আউট হয়ে যাবে। একে বলা হয় 'ডাবল্ প্লে'।

যারা ফিল্ডিং করছে তাদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়— **'ব্যাটারী'র ফিল্ডার, ইনফিল্ডের ফিল্ডার ও আউটফিল্ডের ফিল্ডার।** পিচার ও ক্যাচার ব্যাটারীর ফিল্ডার। তিন বেসম্যান ও সর্ট স্টপ হল ইনফিল্ডের ফিল্ডার। প্রথম বেসে বা তার কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়ায় ফার্স্ট বেসম্যান, প্রথম ও দ্বিতীয় বেসের মাঝামাঝি সেকেণ্ডম্যান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেসের মাঝামাঝি সর্ট স্টপ এবং তৃতীয় বেসে তার কাছাকাছি থার্ড বেসম্যান। বাকী তিনজন ফিল্ডার আউটফিল্ডের যেমন জায়গায় দাঁড়াবে, অর্থাৎ ডান দিকে, মাঝখানে বা বাঁ দিকে, সেই অনুসারে তারা হবে রাইট ফিল্ডার, সেণ্টার ফিল্ডার ও লেফ্ট্ ফিল্ডার।

ক্যাচাররা দস্তানা (গ্লাভ্স) এবং একরকম পাগড়ি ব্যবহার করে। পাগড়ি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। কারণ ব্যাটারের চালানো ব্যাট থেকে আঘাতের সম্ভাবনা থাকে। পাগড়িগুলি অনেকটা অসিক্রীড়ার (ফেন্সিং) মুখোসের মত। মেয়েদের খেলায় ক্যাচারের মুখোস ছাড়াও শরীর বাঁচাবার উপযোগী কিছুটা গার্ড পরা বাধ্যতা-মূলক।

টেনিকয়েট

টেনিকয়েট খুব সহজ অথচ আনন্দদায়ক খেলা। এই খেলা সকলেই খেলতে পারে। খেলা হয় একটি রাবারের রিংয়ের সাহায্যে। উভয়পক্ষে একজন করে মোট দু'জন খেলোয়াড় বা ডাবলস্ হলে দু'জন করে মোট চারজন খেলোয়াড় এই খেলা খেলতে পারে। যে রিং নিয়ে খেলা হয় তার ব্যাস ৭ ইঞ্চি (১৭.৭৮ সেন্টিমিটার), ঘনত্ব ১$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি (৩.১৭ সেন্টিমিটার) এবং ওজন ৭ থেকে ৯ আউন্স (১৯৮.৫ থেকে ২৫৫ গ্রাম) হয়। কোর্টটি লম্বায় ৪০ ফুট (১২.১৮ মিটার) এবং চওড়ায়



টেনিকয়েট কোর্ট, গোলকগুলি খেলোয়াড় বোঝাচ্ছে

১৮ ফুট (৫.৫০ মিটার) হতে হবে—ডাবলস্ খেলার ক্ষেত্রে। একদিকে একজনই খেলোয়াড় খেললে, অর্থাৎ সিঙ্গলস্ খেলা হলে কোর্ট ৯ ফুট (২.৭৫ মিটার) চওড়া হবে ; এক্ষেত্রে বড় বা ডাবলস্ কোর্টের অর্ধেক নিয়েই খেলা যায়। কোর্টের দুই লম্বা দিকের ঠিক মাঝখানের দু'ধারে থাকছে ৫ ফুট (১.৫৪ মিটার) উঁচু দুটি খুঁটি বা পোস্ট। এই দুই পোস্টে জাল লাগানো থাকে। জালটি লম্বায় ১৮ ফুট (৫.৫০ মিটার) থেকে ২০ ফুট (৬.১০ মিটার) এবং চওড়ায় ১$\frac{১}{২}$ ফুট (৪৫.৭২ সেন্টিমিটার) হয়।

জালের মাথা পোস্টে মাটি থেকে ৫ ফুট (১.৫৪ মিঃ) উঁচুতে থাকে ও উপরের দিকটি সাদা ফিতে দিয়ে মোড়া থাকে। ফিতের ভিতর দিয়ে একটি সরু দড়ি দু'পাশেই কিছুটা বার করা থাকে ; এই অংশ পোস্টের মাথায় শক্ত করে বেঁধে দিয়ে জাল আটকাতে হয়। নেট থেকে দু'দিকে ৩ ফুট অর্থাৎ .৯১মিটার (মোট ৬ ফুট বা ১.৮৩ মিটার) জায়গা ছেড়ে রাখতে হয়—এই জায়গাতে কোনও খেলোয়াড়ের দাঁড়ানোর বা রিং ফেলার নিয়ম নেই। এই জায়গাকে বলা হয় 'নিউট্রাল গ্রাউণ্ড'।

টেনিকয়েট খেলায় ১৫ পয়েন্টে গেম হয়। তিনটি সেটের মধ্যে যে খেলোয়াড় বা জুটি দু'টিতে জিতবে সে বা তারাই ম্যাচ জিতবে। তবে ১৪-১৪ হয়ে গেলে সেট বাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ যতক্ষণ না এক পক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি (যেমন, ১৭-১৫ বা ২৪-২২) এগোচ্ছে ততক্ষণ খেলা চলে।

রিং এক পক্ষ ছুঁড়ে দেবে ও অপর পক্ষ ধরে নেবে—এক কথায় এটাই টেনিকয়েট খেলার সব কিছু হলেও রিং ছোঁড়বার ও ধরার কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। রিং যে কোনও হাত দিয়েই ধরতে পারা যাবে, তবে একহাতে ধরতে হবে, দু'হাতে নয়। আর যে-হাত দিয়ে ধরা হচ্ছে সেই হাত দিয়েই ছুঁড়ে ফেরত পাঠাতে হবে। ছুঁড়ে দেওয়ার কাজটি সঙ্গে সঙ্গেই করতে হবে, দেরি হলে চলবে না। রিং ধরে ছোঁড়বার ভান করে না ছুঁড়ে ধরে রাখাও কোনওক্রমেই চলবে না। শুধু তাই নয়, যে জায়গায় খেলোয়াড় রিং ধরছে, সেই জায়গা থেকেই সেটা ছুঁড়ে ফেরত পাঠাতে হবে, রিং ধরে এগিয়ে যাওয়া চলবে না। এই সব নিয়ম যে খেলোয়াড় ভঙ্গ করবে তার বা তাদের দিকের পয়েন্ট নষ্ট হবে। রিং সব সময়েই নেটের উপর দিয়ে পাঠাতে হবে। কোনও কারণেই কোনও খেলোয়াড়ের হাত নেট পেরিয়ে অপর কোর্টে যাবে না।

সার্ভ করার সময় বা পরে খেলা চলার সময় যদি এক পক্ষের ছুঁড়ে-দেওয়া রিং প্রতিপক্ষের কোর্টে এমন অবস্থায় পড়ে যে, সেই

পক্ষের খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়রা রিং ধরতে পারল না, তা হলে যারা ধরতে পারল না তাদের পয়েন্ট যাবে। কিন্তু একইভাবে (অর্থাৎ যে পক্ষের উদ্দেশ্যে রিং ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে সেই পক্ষের খেলোয়াড়ের ছোঁওয়া না লেগে) রিং কোর্টের বাইরে পড়লে যারা ছুঁড়ল তাদের পয়েন্ট যাবে। আর, রিং যদি কোনও খেলোয়াড়ের ছোঁওয়া লেগেও পড়ে যায়, তা হলে তার বা তাদের (যার ছোঁওয়া লেগে পড়েছে) পয়েন্ট যাবে, এমন কি যদি সেই খেলোয়াড় ও রিং দুই-ই কোর্টের সীমানার বাইরে থাকে। কিন্তু খেলোয়াড়টি যদি সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে রিং ধরে ফেলে, তাহলে সেটি আইনসিদ্ধ হবে। নিউট্রাল গ্রাউণ্ডে কেউ দাঁড়ালে তার পয়েন্ট যাবে। কিন্তু নিউট্রাল গ্রাউণ্ডে রিং পড়লে, যে রিং ছুঁড়ল তারই পয়েন্ট যাবে। রিং মাটির যে জায়গা সর্বপ্রথম স্পর্শ করে সেই জায়গাতেই পড়েছে বলে ধরতে হবে—পড়ে খানিকটা দূরে গড়িয়ে গিয়ে যেখানে একেবারে স্থির হয়ে যায়, সেই জায়গায় পড়েছে ধরা ভুল। সুতরাং, যদি প্রথমে বাউণ্ডারি-লাইনের উপর পড়ে রিং কোর্টের বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে কোর্টের মধ্যেই পড়েছে ধরতে হবে।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে—কোনও পক্ষ নিজের বা নিজেদের সার্ভিস ছাড়া পয়েন্ট করতে পারে না। কাজেই উপরে যে যে ক্ষেত্রে পয়েন্ট যাবার কথা বলা হয়েছে সেই সব ক্ষেত্রেই এ-কথাটা খাটবে। হাতে সার্ভিস রয়েছে এমন অবস্থায় 'ক' দল কিছু আইনভঙ্গ করল, তখন তারা সার্ভিস হারাবে ও 'খ' দল সার্ভিস করবার সুযোগ পাবে মাত্র। এইবার 'ক' দল আবার ভুল করলে তবেই 'খ' দলের পয়েন্ট হবে। খেলা আরম্ভ হয়ে কিছুটা অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলেই নিয়মটি বুঝতে পারবে। (পরে বোঝানো হয়েছে।)

যে পক্ষ টসে জয়ী হবে তারা ইচ্ছামত কোর্টের একটি বিশেষ

দিক বেছে নিতে পারে, সে ক্ষেত্রে অপর পক্ষ প্রথমে সার্ভিস করবে। কিংবা জয়ী পক্ষ সার্ভিস নিয়ে অপর পক্ষকে কোর্টের দিক বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতেও পারে। প্রতি নতুন গেম আরম্ভ হওয়ার সময় (এবং তৃতীয় গেমে এক পক্ষ অপর পক্ষের আগে ৮ পয়েন্ট করে ফেললেই) খেলোয়াড়রা দিক-পরিবর্তন করে খেলবে। প্রতিপক্ষ প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত কোনও খেলোয়াড় সার্ভ করতে পারবে না এবং সার্ভ করার সময় রিংটি এদিক-ওদিক করে নড়াতে বা কাঁপাতে পারবে না। সার্ভিসের সময় (এবং অন্য সময়েও) এমনভাবে রিং ছাড়তে হবে, যাতে 'ওভারহ্যাণ্ড ডেলিভারি' না হয়। এজন্যে আইনে বলা হয়েছে যে, রিং হস্তচ্যুত হওয়া মাত্রই অন্ততঃ ইঞ্চি-ছয়েক উপরে শূন্যে উঠবে। (এ-রকম বলার কারণ এই যে, সর্তটি মানলে ডেলিভারি ওভারহ্যাণ্ড করা যাবে না।) যদি সার্ভ করার পর রিং নেটের উপর দিয়ে যেতে নেট ছুঁয়ে যায় এবং সার্ভিসে অন্য কোনও রকম ত্রুটি না থাকে তা হলে ঐ সার্ভিস ধরা হবে না—'লেট' হবে এবং সার্ভার আবার সার্ভ করবে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে যদি অপর পক্ষের কারও ছোঁওয়া না লেগে বলটি কোর্টের সীমানার বাইরে বা 'ভুল' কোর্টে পড়ে তাহলে অপর পক্ষ সার্ভিস পাবে। আর যদি অপর পক্ষের যে খেলোয়াড়ের দিকে সার্ভ করা হয়েছে, সার্ভের পর রিং নেটের মাথা ছোঁওয়া সত্ত্বেও সেই খেলোয়াড় রিং ধরে ফেলে, তাহলেও মনে করে নেওয়া হয় যে, রিং ঠিক কোর্টেই পড়ত এবং এ ক্ষেত্রেও সার্ভিস ধরা হবে না, লেট হবে।

যদি ডাবলস্-এর খেলা হয়, তা হলে যে-পক্ষ প্রথম সার্ভ নিয়েছে (বা পেয়েছে) সেই পক্ষের একজন খেলোয়াড় তাদের কোর্টের ডান দিকের অর্ধের পিছনের লাইনের উপর বা পিছন থেকে (নক্শা দেখ) প্রতিপক্ষের কোর্টের কোণাকুণি অর্ধটিতে সার্ভ করবে এবং সার্ভকারীর সহ-খেলোয়াড় কোর্টের বাঁ দিকের অর্ধে দাঁড়াবে। (সার্ভ করছে যে-পক্ষ, তাদের বলা হয় 'সাইড-ইন্', অপর পক্ষকে 'সাইড-

আউট'।) যার উদ্দেশ্যে সার্ভ করা হয়েছে তাকেই রিং ধরতে হবে, এবং ধরার পর সে অপর কোর্টের মধ্যে যে কোনও দিকে ফেরত পাঠাবে, এর পর 'ইন্-সাইড' রিং ফেরৎ পাঠাবে—এইভাবে খেলা চলবে, যতক্ষণ না কেউ পয়েন্ট করার ফলে রিং 'ডেড্' হয়ে যাচ্ছে। যদি ইন্-সাইড প্রথম পয়েন্ট পায়, তা হলে তাদের এক পয়েন্ট গোনা হবে। (কিন্তু ইন্-সাইডের যদি পয়েন্ট যায় তা হলে প্রকৃতপক্ষে আউট-সাইডের পয়েন্ট হবে না, ইন্-সাইড সার্ভিস হারাবে মাত্র—কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে, নিজের বা নিজেদের সার্ভিস থেকেই পয়েন্ট করতে হয়।)

ইন্-সাইড প্রথমে পয়েন্ট করলে অর্থাৎ 'ওয়ান, লাভ্' করলে তাদের যে খেলোয়াড় সার্ভ করছিল, সে-ই সার্ভ করতে থাকবে। তবে কোর্টের বাঁ দিকের অর্ধের পিছন থেকে (এবং তার পার্টনার বা সহ-খেলোয়াড় যাবে কোর্টের ডান অর্ধে) আগের মতই, প্রতিপক্ষের যে খেলোয়াড় কোণাকুণি দাঁড়িয়ে আছে, তার উদ্দেশ্যে। আউট-সাইডের খেলোয়াড়রা যতক্ষণ না সার্ভিস পেয়ে ইন্-সাইড হচ্ছে ততক্ষণ কোর্ট বদল করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্-সাইড পয়েন্ট জিতে যাচ্ছে ততক্ষণ তাদেরই হাতে সার্ভিস থাকবে, কিন্তু তারা পয়েন্ট হারালেই সার্ভিস প্রতিপক্ষের হাতে চলে যাবে। ইন্-সাইডের হাত থেকে সার্ভিস চলে গেলে তারা হবে আউট-সাইড এবং সার্ভিস পেয়ে পূর্বের আউট-সাইড হবে ইন্-সাইড। নতুন ইন্-সাইডের সার্ভিস করবে বাঁ দিকের কোর্টের খেলোয়াড় এবং যখন এরা সার্ভিস হারাবে তখন এই খেলোয়াড় ডান দিকের কোর্টে চলে যাবে (এবং ডান দিকের কোর্টের খেলোয়াড় বাঁ দিকে আসবে এবং আবার সার্ভিস পেলে সে-ই সার্ভিস করবে); এইভাবে সার্ভার বদল হতে থাকবে।

সিঙ্গলস্-এর খেলায় অবশ্য এ-সব প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, সেখানে কোর্ট বদল হয় না। সিঙ্গলস্-এ তাই শুধু সার্ভিস বদলই হয়।

ব্যাডমিণ্টন

ব্যাডমিণ্টনের উৎপত্তি ইংল্যাণ্ডের গ্লসেস্টারশায়ারে। ১৮৬০ সালে ওখানকার ব্যাডমিণ্টন হলে প্রথম খেলা হয়। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের এই খেলা প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চাশের দশক থেকে এখনও পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়রা এতে গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। ব্যাডমিণ্টনে ছেলেদের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক টুর্ণামেণ্ট 'টমাস কাপে'র খেলা, মেয়েদের বড় টুর্ণামেণ্ট 'উবের কাপ'। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি উঁচুতে বল (পালকের) পাঠিয়েছেন ফ্রাঙ্ক রুগানি। ১৯৬৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ক্যালি-ফোর্ণিয়ার সান জস টেস্টে তাঁর বল ৭৯ ফুট ৮½ ইঞ্চি (২৪.৩ মিটার) উপরে তুলেছিলেন। সবচেয়ে বেশি সময় খেলা হয়েছিল ১৯৭০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডের ইপস্যুইচ-এ। পাঁচশ' স্কুলছাত্র খেলেছিল একনাগাড়ে ২৯০ ঘণ্টা।

ব্যাডমিণ্টনে অন্যান্য খেলার মত সিঙ্গলস্ ও ডাবলস্ খেলা হয়। সিঙ্গলসে দু'দিকে দু'জন থাকে, ডাবলসে ২ + ২ = ৪।

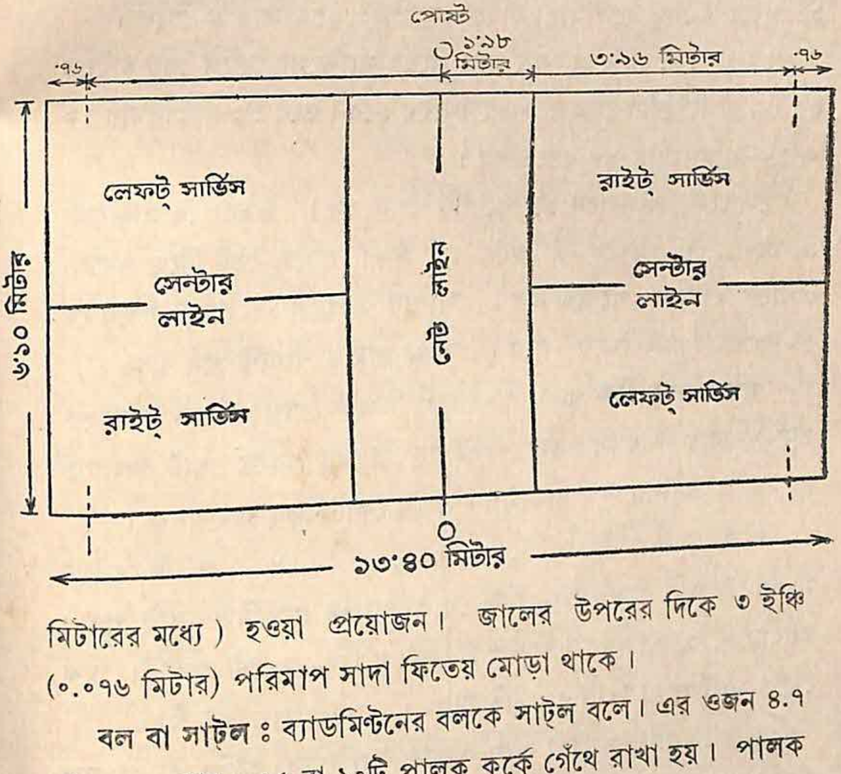
কোর্ট : ডাবলস্ কোর্টের দৈর্ঘ্য ১৩.৪০ মিটার ও প্রস্থ ৬.১০ মিটার। স্থানাভাবে ডাবলস্ কোর্ট করা না গেলে আলাদা সিঙ্গলস্ কোর্ট করে নিতে হয়। এ-ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য একই থাকবে, কিন্তু প্রস্থ হবে ৫.১৮ মিটার।

মূল কোর্টকে লম্বালম্বি দু'ভাগে বিভক্ত করে সেণ্টার-লাইন টানা হয় ব্যাক বাউণ্ডারি থেকে সর্ট সার্ভিস লাইন পর্যন্ত। দু'দিকের সর্ট সার্ভিস লাইনের ঠিক মাঝে আড়াআড়িভাবে থাকে নেট বা জাল। কোর্টে প্রতিটি লাইন যেন ৪ সেন্টিমিটার পুরু সাদা বা কালো যে কোনও রং-এ টানা হয়।

পোস্ট : জাল টাঙানোর জন্য দু'পাশে পোস্টের উচ্চতা মাটি থেকে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি বা ১.৫৫ মিটার। এই পোস্ট দু'টি এমন হওয়া দরকার যেন সাট্ল লেগে নড়বড়ে না হয়। এক পোস্ট থেকে অপর পোস্ট পর্যন্ত ২ ফুট ৬ ইঞ্চি (৭৬ সেন্টিমিটার) চওড়া থাকে। পোস্টের

দু'দিকে জালের উপরের দিকে উচ্চতা হবে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি (১.৫৫ মিটার) এবং মধ্যবর্তী স্থানে ৫ ফুট (১.৫২৪ মিটার)। জালের ঘরগুলি অত্যন্ত ছোট (⅝ ইঞ্চি থেকে ¾ ইঞ্চির অর্থাৎ ০.০১৬ থেকে ০.০১৯

ব্যাডমিন্টন কোর্ট



মিটারের মধ্যে) হওয়া প্রয়োজন। জালের উপরের দিকে ৩ ইঞ্চি (০.০৭৬ মিটার) পরিমাপ সাদা ফিতেয় মোড়া থাকে।

বল বা সাট্‌ল ঃ ব্যাডমিণ্টনের বলকে সাট্‌ল বলে। এর ওজন ৪.৭ থেকে ৫.৫ গ্রাম। ১৫ বা ১০টি পালক কর্কে গেঁথে রাখা হয়। পালক লম্বায় ২½ ইঞ্চি থেকে ২¾ ইঞ্চি (০.০৬৪ থেকে ০.০৭০ মিটার)।

খেলা শুরু ঃ টসে বিজয়ী খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়রা স্থির করে কোন্ কোর্ট নেবে বা প্রথম সার্ভিস করবে কি না।

ডাবলস্ বা ছেলেদের সিঙ্গলস্ খেলায় কত পয়েণ্টে (১৫ বা ২১) গেম হবে তা আগেই স্থির করে নিতে হয়। ১৫ পয়েণ্টের গেমে দুই পক্ষের পয়েণ্ট যখন ১৩, তখন যে পক্ষ আগে পয়েণ্ট করে তারা বা সে ইচ্ছানুযায়ী সেট নিতে পারে। তখন সেটের গেম হবে ৫ পয়েণ্টে।

আর উভয় পক্ষের ১৪ পয়েন্ট হলে, যে পক্ষ আগে ১৪ করে তারা ইচ্ছানুযায়ী সেট নিতে পারে। তখন সেটের গেম ৩ পয়েন্টে হবে।

যে কোনও খেলায় স্কোর ডাকা শুরু হয় 'লাভ্, অল'* বলে। ১৩ পয়েন্টের সেটে আগে যে বা যারা ৫ করে তারা বা সে জিতবে। ১৪ পয়েন্টে সেট হলে যারা বা যে আগে ৩ করে তারাই জেতে।

১৩ বা ১৪, যে কোনও ক্ষেত্রে পরের সার্ভিসের আগে সেট চাইতে হয়। ২১ পয়েন্টের গেমও একই নিয়মে হবে। তবে ১৩-র জায়গায় ১৯ ও ১৪-র জায়গায় ২০ ধরতে হয়।

মেয়েদের সিঙ্গলসে ১১ পয়েন্টে গেম হয়। উভয় খেলোয়াড়ের ৯ হলে, যে প্রথমে ৯ করে সে ইচ্ছা করলে সেট নিতে পারে। এখানে গেম ৩ পয়েন্টে হয়। আবার উভয়ের ১০ হলে, আগে যে ১০ করে সে সেট নিতে পারে। তখন গেম ২ পয়েন্টে হয়ে থাকে।

আগে কিছু ঠিক করা না থাকলে তিনটি খেলার ফলের ভিত্তিতে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় গেমের শুরুতে কোর্ট বদলাতে হয়, আর তৃতীয় গেমে মাঝামাঝি সময়ে কোর্ট বদল হয়ে থাকে।

সিঙ্গলসের খেলা : ০, ২, ৪, ৬, ৮ বা ১০ ইত্যাদি জোড় সংখ্যার পয়েন্ট হলেই ডান দিক থেকে সার্ভিস বা রিসিভ করাই প্রথা। আবার ১, ৩, ৫, ৭ বা ৯ অর্থাৎ বিজোড়সংখ্যক পয়েন্ট হলে বাঁ দিক থেকে সার্ভিস বা রিসিভ করাই নিয়ম। সেট হলেও এই নিয়ম।

ভুল : সার্ভিসকারী ভুল করলে সার্ভিসের অধিকার হারাতে হয়। আর তার বিপক্ষ খেলোয়াড় ভুল করলে সার্ভিসকারী একটি পয়েন্ট পায়। সার্ভিস যেন ভুল কোর্টে না পড়ে। শর্ট সার্ভিস লাইনের আগে বা লং সার্ভিস লাইনের পিছনে যেন না পড়ে।

*'শূন্য' বা 'কিছু নয়' বোঝাতে বহু খেলায় ব্যবহৃত 'লাভ্' কথাটি সর্বপ্রথমে টেনিসে সীমাবদ্ধ ছিল। মূল ফরাসী শব্দটি হলো "l'œuf", যার অর্থ ডিম। ডিমের আকার অনেকটা শূন্যের মত বলেই ঐ অর্থে মূল শব্দটির বিকৃতি 'লাভ্'-এর ব্যবহার।

সার্ভিস করার সময় প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা যেন ভীতিজনক অঙ্গ-ভঙ্গী না করে। সাট্‌ল যেন বাউণ্ডারির বাইরে না পড়ে বা জালের নীচ দিয়ে না যায়। কখনও জাল অতিক্রমের আগে সাট্‌ল ফেরৎ পাঠানো যায় না। একই খেলোয়াড় তু'বার মারতে পারে না।

ডাবলসের খেলা : টসের পর যারা সার্ভিস করে তাদের ডান দিকের খেলোয়াড় সাট্‌ল পাঠায় অপর দলের কোণাকুণি খেলোয়াড়কে। রিসিভকারী খেলোয়াড় সাট্‌ল মাটিতে পড়ার আগে বিপক্ষ কোর্টে ফেরৎ পাঠালে তাদের যে কেউ খেলতে পারে। এইভাবে মাটিতে পড়ার আগে পর্যন্ত খেলা চলে। একে বলে 'র‍্যালি'। যারা প্রথমে সার্ভিস করেছিল তারা সাট্‌ল মারতে না পারলে বা ফল্ট (ভুল) করলে সার্ভিসের অধিকার হারায়।

যারা সার্ভিস করে তারা ভুল করলে বিপক্ষের পয়েণ্ট হয় না। কিন্তু বিপক্ষ সার্ভিস ক্লিয়ার করতে বা ঠিকমত ফেরৎ পাঠাতে না পারলেই সার্ভিসকারী দলের পয়েণ্ট হয়। তবে যাকে সার্ভিস করা হচ্ছে বা যার দিকে সাট্‌ল পাঠানো হচ্ছে, তাকেই খেলতে হবে। তার সঙ্গী বল ফেরৎ পাঠালে সার্ভিসকারীরা পয়েণ্ট পায়।

প্রতিটি গেমে প্রথম সার্ভিস যারা করে প্রথমবার তাদের একজনই সার্ভিস করে থাকে। কিন্তু এরপর তু'দলেরই খেলোয়াড়রা পর্যায়-ক্রমে সার্ভিস করে।

পরিচালকবর্গ : ব্যাডমিণ্টন খেলায় একজন আম্পায়ার, তু'জন লাইন-রেফারী, একজন লেট-রেফারী ও একজন স্কোরার প্রয়োজন।

আম্পায়ারই খেলার মূল পরিচালক। আবহাওয়া, আলোর অবস্থা দেখে তিনি খেলা শুরুর আদেশ দেন। খেলার ফলও ঘোষণা করেন। সার্ভিস বা র‍্যালির সময় 'লেট', 'ফল্ট'ও তিনি জানাবেন। লাইন-রেফারীরা লাইনের উপর নজর রাখেন, লেট-রেফারী দেখেন সাট্‌ল নেট ছুঁয়েছে কিনা। কারও পয়েণ্ট হলে স্কোরার তা লিখে রাখেন।

টেবল টেনিস

টেবল টেনিস বা পিং পং খেলাকে লন্ টেনিস খেলার ঘরোয়া সংস্করণ হিসাবে অনেকে অভিহিত করেন। কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্যতা আছে। কারণ, লন্ টেনিস খেলার সঙ্গে এর কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আজ আর এ খেলা বৈঠকখানার খেলা বা 'পার্লার গেম' নয় ; আজ এটি একটি জনপ্রিয় খেলা এবং এতে সাফল্য অর্জন করতে গেলে রীতিমত দক্ষতার প্রয়োজন। ১৯২৩-২৭ সাল থেকে টেবল টেনিসে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

অবশ্য ঠিক কোন্ দেশে টেবল টেনিস প্রথম খেলা হয় তা বলা শক্ত। তবে ১৮৮০ সালের কিছু পরে লণ্ডনের এক ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের ক্যাটালগ বা মূল্য-তালিকায় এই ধরনের এক খেলার কথা জানা যায়। লণ্ডনেই ১৯০২ সালে পিং পং অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সেখানে ১৯২১ সালে আবার এই খেলা নতুন করে চালু করা হয়। তারপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রমশঃ এই খেলা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, চীন ও জাপানের খেলোয়াড়রা এতে বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জন করে। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে হাঙ্গেরীর ভিক্টর বার্ণা ৫ বার সিঙ্গলসে এবং জুটি-সহ ৮ বার ডাবলসে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তিনবারের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন চীনের চুয়াং সে-তুং এত জোরে বল 'স্ম্যাশ' করতেন যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন স্ম্যাশের পর বলটি ঘণ্টায় ৬০ মাইলেরও (৯৬ কিলোমিটার) বেশি বেগে ছুটে যেত।

টেবল টেনিসে সিঙ্গলস্ ও ডাবলস্ দু'রকম খেলাই হয়। সিঙ্গলসে একদিকে একজন করে মোট দু'জন এবং ডাবলসে একদিকে দু'জন করে মোট চারজন খেলোয়াড় থাকে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই টেবলের মাপ একই—অর্থাৎ লম্বায় ৯ ফুট (২.৭৪ মিটার) এবং

চওড়ায় ৫ ফুট (১.৫৪ মিটার) এবং টেবলের যেদিকে খেলা হয় সেদিকটি ('প্লেয়িং সার্ফেস') মেঝে থেকে ২½ ফুট (৭৬.২ সেন্টিমিটার) উঁচুতে থাকে। টেবলের রং গাঢ় হওয়া চাই—গাঢ় ও অনুজ্জ্বল সবুজ হলেই ভালো এবং এর চারদিকে ¾ ইঞ্চি (১.৯ সেন্টিমিটার) চওড়া সাদা লাইন টানতে হয়। লম্বার দিকের ছ'টি লাইনকে 'সাইড-লাইন' এবং চওড়ার ছ'টি লাইনকে 'এণ্ড-লাইন' বলা হয়। একই টেবলে যাতে প্রয়োজনমত ডাবলস্ খেলা যায়, সেই জন্যে ছুই এণ্ড-লাইনের মধ্য-বিন্দুকে যুক্ত করে সাইড-লাইন ছ'টির সঙ্গে সমান্তরাল করে একটি ⅛ ইঞ্চি (০.৩২ সেন্টিমিটার) চওড়া সেণ্টার-লাইনও পাকাপাকিভাবে এঁকে নেওয়া হয়। টেবলের ছুই এণ্ড-লাইনের সমান্তরাল করে এমন-ভাবে নেট লাগানো হয়, যাতে টেবলটি ছ'টি সমান মাপের কোর্টে বিভক্ত হয়। নেট যাতে সোজা অবস্থায় থাকে তার জন্য ছ'দিকেই ৬ ইঞ্চি (১৫.২৪ সেন্টিমিটার) উঁচু দণ্ডের সঙ্গে শক্ত কর্ড লাগিয়ে সেই কর্ডের সাহায্যে নেটকে শক্ত করে টেনে রাখা হয়। ছ'দিকেই এই দণ্ড সাইড-লাইন ছেড়ে ৬ ইঞ্চি (১৫.২৪ সেন্টিমিটার) দূরে থাকবে। নেটটির উপর দিক টেবল থেকে ৬ ইঞ্চি (১৫.২৪ সেন্টিমিটার) উঁচুতে থাকবে। টেবল টেনিস বল সেলুলয়েডের তৈরি এবং সাদা রংয়ের হবে। বলের পরিধি ১.৪৬ ইঞ্চির (৩.৭ সেন্টিমিটার) কম বা ১.৫০ ইঞ্চির (৩.৮১ সেন্টিমিটার) বেশি হবে না এবং ওজন ৩৭ গ্রেণের কম (৪½ আউন্স/১২৭.৫ গ্রাম) বা ৩৯ গ্রেণের (৪¾ আউন্স/১৩৪.৬গ্রাম) বেশি হবে না। ব্যাট কাঠের তৈরি হয়, তবে হাতল বাদে ব্যাটের সবটাই পাতলা রাবার দিয়ে ঢাকা থাকে।

টেবল টেনিসে ২১ পয়েণ্টে গেম হয়। যে খেলোয়াড় (বা জুটি) আগে ২১ পয়েণ্ট করবে সে (বা তারাই) গেম জিতবে। এই রকম একটি গেম বা তিনটি বা পাঁচটি গেমে ম্যাচ হতে পারে। তিনটিতে হলে যে খেলোয়াড় বা জুটি অন্ততঃ ছ'টি গেম জিতবে সে বা তারাই জয়ী হবে এবং পাঁচটির ক্ষেত্রে জয়ী পক্ষকে অন্ততঃ তিনটি গেম পেতে

হবে। তবে দু'পক্ষই ২০ পয়েন্ট করেছে—কোনও গেমে যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায়, তবে একপক্ষ অপরের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়া মাত্রই গেম জিতবে।

সার্ভিসের পর থেকে একবারে যতক্ষণ বল খেলার মধ্যে থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ না বল 'ডেড্' হচ্ছে, ততক্ষণকে একটি 'র্যালি' বলা হয়। কোনও র্যালিতে যে প্রথম বল মারছে তাকে 'সার্ভার' বলে এবং তার পরেই যে মারছে সে 'রিসিভার'।

টেবলের কোন্ প্রান্ত কে বেছে নেবে এবং কে প্রথম সার্ভিস করবে বা সার্ভিস গ্রহণ করবে (রিসিভ করবে) এ-সবের মীমাংসা হয় টসের সাহায্যে। যে টসে জিতবে সে যদি প্রথমে সার্ভিস করতে বা সার্ভিস গ্রহণ করতে চায়, তা হলে অপরজন দিক বেছে নেবে। আবার এর উল্টোও হতে পারে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, জয়ী খেলোয়াড় পরাজিতকেই সুযোগ দিল প্রথমে পছন্দ জানাবার। ডাবলসের বেলায় প্রথম গেমে যে পক্ষ প্রথম পাঁচটি সার্ভিস করবে তারা ও অপর পক্ষ যথাক্রমে ঐ সময়ের জন্য সার্ভার ও রিসিভার ঠিক করে নেবে ; দ্বিতীয় পাঁচটি সার্ভিসের বেলায় প্রথম পাঁচটির রিসিভার সার্ভ করবে এবং প্রথম সার্ভারের সহ-খেলোয়াড় বা পার্টনার রিসিভ করবে। তৃতীয় পাঁচটি সার্ভিস করবে প্রথম পাঁচটির সার্ভারের পার্টনার এবং রিসিভ করবে প্রথম পাঁচটির রিসিভারের পার্টনার। চতুর্থ পাঁচটি সার্ভিস করবে প্রথম রিসিভারের পার্টনার ও রিসিভ করবে প্রথম সার্ভার। পঞ্চম পাঁচটি সার্ভিস হবে প্রথম পাঁচটির মতই এবং গেম শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ক্রম-অনুযায়ী চলবে।

সিঙ্গলস্ খেলায় প্রথমে সার্ভার সার্ভিস করবে এবং তারপর রিসিভার 'রিটার্ণ' করবে। এবার সার্ভার রিটার্ণ করবে এবং তারপর রিসিভারের রিটার্ণ করার পালা। এইভাবে খেলা চলতে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে, সিঙ্গলসে প্রতি পাঁচ পয়েন্ট অন্তর

সার্ভিস বদলায়, অর্থাৎ পাঁচ পয়েন্ট হয়ে গেলেই সার্ভার রিসিভ করবে ও রিসিভার সার্ভ করবে এবং গেমের শেষ পর্যন্ত এইভাবে চলতে থাকবে (অবশ্য যে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয় সেটা ছাড়া)। ডাবলস্ খেলায় প্রথমে এক পক্ষের খেলোয়াড় সার্ভার হিসেবে সার্ভ করবে, তারপর রিসিভার রিটার্ন করবে এবং তারপর এই ক্রম-অনুযায়ী প্রত্যেক খেলোয়াড় রিটার্ন করে যাবে।

কী ভাবে সার্ভিস ও রিটার্ন করা হয় ?

সার্ভিস ঃ সার্ভারের যে হাতে র‍্যাকেট নেই সেই হাতের তালুতে বলটি নিশ্চল অবস্থায় রাখতে হবে। বলটি না ঘুরিয়ে দিয়ে সার্ভার উপর দিকে প্রায় লম্বভাবে হাতে করে এমনভাবে ছুঁড়ে দেবে, যেন আম্পায়ার সেটিকে আগাগোড়াই দেখতে পান এবং যেন হাতের তালু ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াটা দেখতে পাওয়া যায়। বলটি যখন উপর থেকে নীচে পড়ছে, তখন সেটিকে এমনভাবে মারতে হবে, যেন সেটি প্রথমে সার্ভারের কোর্টে পড়ে এবং তারপর নেটের সরাসরি উপর দিয়ে কিংবা নেট বেষ্টন করে রিসিভারের কোর্ট স্পর্শ করে। ডাবলসের খেলায় বলটিকে প্রথমে সার্ভারের কোর্টের ডান দিকের অর্ধে কিংবা নেটের যে-পাশে সে আছে সেই পাশের সেণ্টার-লাইনে ফেলতে হবে এবং বলটি নেটের সরাসরি উপর দিয়ে বা নেট বেষ্টন করে রিসিভারের কোর্টের ডান দিকের অর্ধ কিংবা নেটের যে পাশে রিসিভার আছে সেই পাশের সেণ্টার-লাইন ছোঁয়। সার্ভার যখন হাতে বল রাখবে তখন হাতটি টেবলের লেভেলের উপরে খোলা অবস্থায় থাকবে, সব আঙুল জোড়া থাকবে, কেবল 'বুড়ো' আঙুল আলাদা থাকবে। বলটি তালুতে থাকবে এমনভাবে যেন মুঠো করা না হয়। আর যখন বলটি র‍্যাকেট দিয়ে মারা হয় তখন বলটি যেন অবশ্যই এণ্ড-লাইনের কিংবা তার এক কল্পিত বিস্তৃতির পিছনে থাকে। সার্ভিসের পর বা রিটার্ন হবার পর বলটিকে এমনভাবে মারতে হবে,

যাতে সরাসরি নেটের উপর দিয়ে বা নেট বেষ্টন করে গিয়ে একেবারে বিপক্ষ কোর্ট স্পর্শ করে।

কোনও খেলোয়াড় বা জুটি যে প্রান্তে খেলা আরম্ভ করেছিল, সে বা তারা ঠিক পরের গেমেই অপর প্রান্ত থেকে খেলা আরম্ভ করবে এবং ম্যাচ শেষ হওয়া পর্যন্ত এইভাবেই চলতে থাকবে। ম্যাচের সম্ভাব্য শেষ গেমটিতে যখনই প্রথম একজন খেলোয়াড় বা জুটির ১০ পয়েন্ট হয়ে যাবে, তখন তারা প্রান্ত বদল করে নিয়ে খেলবে। এ ছাড়া ডাবলস্ ম্যাচের সম্ভাব্য শেষ গেমে যখনই প্রথম একটি জুটির ১০ পয়েন্ট হচ্ছে তখনই রিসিভিং জুটি রিসিভিং-এর ক্রম বদল করে নেবে। ডাবলস্ ম্যাচের প্রতিটি গেমে রিসিভিং আরম্ভের ক্রম আগের গেমের বিপরীত হবে। আগের গেমে যে খেলোয়াড় বা জুটি প্রথমে সার্ভ করেছিল, তারা ঠিক পরবর্তী গেমে প্রথমে রিসিভ করবে।

যদি কোনও সময় ভুলবশতঃ খেলোয়াড়রা দিক-পরিবর্তন না করে, ভুলটি ধরা পড়া মাত্র তারা অবশ্যই তা করবে। আবার যদি নির্ধারিত ক্রমের বাইরে কোনও খেলোয়াড় সার্ভ বা রিসিভ করে, তাহলেও ভুল ধরা পড়া মাত্র খেলা বন্ধ করতে হবে এবং তারপর যে পয়েন্ট হয়েছে সেই অবস্থাতে সেই খেলোয়াড়ই সার্ভ বা রিসিভ করতে থাকবে খেলার সুরুতে সার্ভিস বা রিসিভিং-এর প্রতিষ্ঠিত ক্রম অনুযায়ী (বা উপরের অনুচ্ছেদমত সেই ক্রমের পরিবর্তন হয়ে থাকলে সেই অনুযায়ী), যার সার্ভার বা রিসিভার হওয়া উচিত ছিল।

যাই হোক, সর্বক্ষেত্রেই ভুল ধরা পড়ার আগের পয়েন্টগুলি গুনতে হবে।

যে র‍্যালির ফল হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না, তাকে 'লেট' বলা হয় এবং যেটির ফল ধরা হয়, তাকে 'পয়েন্ট' বলে।

(১) যদি সার্ভিসের পর বল নেটের উপর দিয়ে যেতে যেতে নেট বা তার দণ্ড ছুঁয়ে যায়, কিন্তু অন্য সব দিক থেকে সার্ভিসটি

বিধিসম্মত হয় বা রিসিভার সেটিকে 'ভলি' করে ; বা (২) রিসিভার বা তার পার্টনার প্রস্তুত নেই এমন অবস্থায় যদি সার্ভিস করা হয় ; বা (৩) খেলোয়াড়ের আয়ত্তের বাইরে এমন কোনও আকস্মিক ঘটনার জন্য খেলোয়াড় বিধিসম্মত সার্ভিস করতে বা রিটার্ণ করতে অক্ষম হয় বা অন্য কোনওভাবে র‍্যালিটির সমাপ্তি ঘটাতে বাধ্য হয় ; বা (৪) যদি খেলার ক্রম বা দিক-সংক্রান্ত ভুল সংশোধনের জন্যে খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয় ; বা (৫) যদি 'এক্সপিডাইট' প্রথার প্রয়োগের জন্য খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়, তা হলে **র‍্যালিটি 'লেট' হবে।**

উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া যদি কোনও খেলোয়াড় (১) বিধিসম্মত সার্ভিস করতে না পারে ; বা (২) তার বিপক্ষীয় খেলোয়াড় বিধিসম্মত সার্ভিস বা রিটার্ণ করার পর সে ঠিকমত রিটার্ণ করতে না পারে ; বা (৩) সে বা তার র‍্যাকেট বা সে পরে আছে বা তার শরীরে লাগানো আছে এমন কিছু যদি নেট বা তার দণ্ড ছুঁয়ে ফেলে বা খেলার টেবলটি স্থানচ্যুত করে—যখন বলটি খেলার মধ্যে ; বা (৪) তার যে হাতে র‍্যাকেট নেই সেই হাতটি টেবলের খেলার পিঠটি ছুঁয়ে ফেলে ; বা (৫) প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের মারার পর বলটি খেলার মধ্যে গণ্য হওয়ার আগে এণ্ড-লাইন বা সাইড-লাইনের উপর দিয়ে যাচ্ছে এবং এখনও টেবলের খেলার পিঠ ছোঁয়নি, এমন অবস্থায় বলটি তার (খেলোয়াড়ের) বা সে পরে আছে বা তার গায়ে লাগানো আছে এমন কিছুর সংস্পর্শে আসে ; বা (৬) বলটি 'ভলি' করে ; বা (৭) ডাবলস্-এর খেলায় ক্রম না মেনে বল মারে ; বা (৮) এক্সপিডাইট প্রথায় তার সার্ভিস এবং সার্ভকারী খেলোয়াড়ের বা জুটির পরবর্তী বারোটি মার রিসিভিং খেলোয়াড় বা জুটি বিধিসম্মতভাবে ফিরিয়ে দেয়, তা হলে সেই খেলোয়াড় বা জুটি একটি পয়েন্ট হারাবে **অর্থাৎ বিপক্ষের একটি পয়েন্ট হবে।**

বলটি যে মুহূর্তে সার্ভকারী খেলোয়াড়ের হাত থেকে সার্ভিসের

জন্যে বেরিয়ে আসে সেই মুহূর্ত থেকেই সেটিকে খেলার মধ্যে বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু যদি বলটি (১) পর-পর দু'বার একই কোর্ট ছোঁয়; বা (২) সার্ভিসের সময় ছাড়া পর-পর দু'টি কোর্ট ছোঁয়; বা (৩) কোনও খেলোয়াড় বলটিকে পর-পর একাধিকবার মারে; বা (৪) বলটি কোনও খেলোয়াড় বা সে যে পোশাক পরেছে বা তার শরীর-সংলগ্ন কিছু ছোঁয়; বা (৫) বল 'ভলি' করা হয়; বা (৬) নেট, তার দণ্ড বা উপরে উল্লেখ করা কিছু ছাড়া আর কিছু ছোঁয়; বা (৭) ডাবলস্-এর সার্ভিসে সার্ভার বা রিসিভারের কোর্টের বাঁ অর্ধাংশ ছোঁয়; বা (৮) ডাবলস্-এর খেলায় যদি ক্রম না মেনে বলটি মারা হয়, তা হলে আর বলটিকে খেলার মধ্যে ধরা হবে না এবং যে যে ক্ষেত্রে অপরাধী খেলোয়াড়ের পয়েন্ট যাওয়ার ব্যবস্থা আছে তার পয়েন্ট যাবে, অর্থাৎ বিপক্ষের পয়েন্ট হবে।

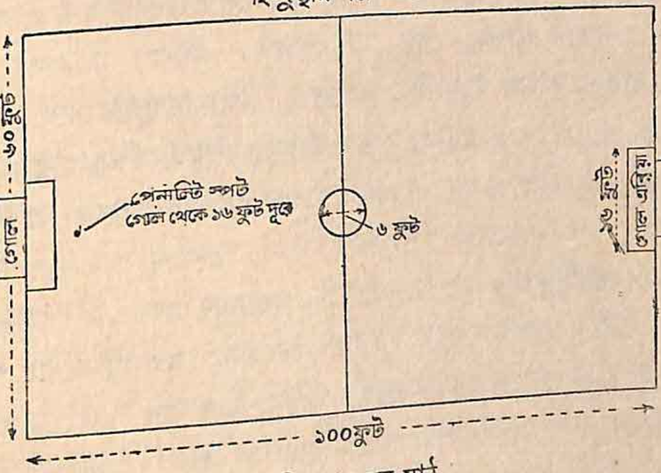
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুস্থান বল

এটি সম্পূর্ণ ভারতীয় খেলা। স্বাধীনতালাভের বহু আগে এই খেলার প্রচলন হয়। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে—এই অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুস্থান বল খেলা নিষিদ্ধ করেন। তারপর আর এই খেলাটির তেমন প্রচার ও প্রসার হয়নি। কলকাতার ছাত্র সমিতি এই খেলার উদ্ভাবক।

মাঠ: তৎকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে হিন্দুস্থান বল সম্পর্কে যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে জানা যায়।

হিন্দুস্থান বল মাঠ



হিন্দুস্থান বল মাঠ

মাঠের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, প্রস্থ ৬০ ফুট ; ফুটবল মাঠের মতই সীমানা থাকে চতুর্দিকে। ফুটবলের মতই সেন্টার-লাইন ও সেন্টার সার্কল থাকে। গোলের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট এবং মাটি থেকে পোস্টের উচ্চতা ৭ ফুট। গোল-এলাকার দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও প্রস্থ ১২ ফুট। পেনাল্টি-বক্স থাকে গোল থেকে ১৭ ফুট দূরে।

খেলা : প্রতি অর্ধে ২০+২০=৪০ বা ২৫+২৫=৫০ মিনিট এবং বিরতির জন্য ৫ মিনিট রাখা হয়। প্রতি দলে ৭ বা ৯ জন নিয়ে খেলা যেতে পারে দুই দলে। দু'হাতে বল ছোঁড়া, যে কোনও হাত দিয়ে মারা বা ধাপানো যায়। পা ও হাঁটু বাদে শরীরের কোমরের উপরের যে কোনও অংশ হিন্দুস্থান বল খেলায় ব্যবহার করা চলে। উদ্দেশ্য গোল দেওয়া। ফুটবলের মতই খেলোয়াড়দের গোলকীপার, ব্যাক, হাফব্যাক, ফরওয়ার্ড ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। সেকালে গোলে ১, ব্যাকে ১, হাফে ২ ও ফরওয়ার্ডে ৩ জন নিয়ে বেশির ভাগ ম্যাচ খেলা হত।

টসে যে-দল জেতে তারা বল ছুঁড়ে খেলা শুরু করে। কিন্তু বল হাতে নিয়ে ২ পা-র বেশি যাওয়া যায় না। ৫ সেকেণ্ডের বেশি বল হাতে রাখাও আইন-বিরুদ্ধ। এসব দিক থেকে এখনকার হ্যাণ্ড-বলের সঙ্গে হিন্দুস্থান বলের যথেষ্ট মিল আছে। আবার ফুটবলের মত অফ্-সাইড, ফাউল ইত্যাদিও প্রচলিত। তবে হিন্দুস্থান বলে গোল-কীপার পা দিয়ে বল থামিয়ে গোল বাঁচাতে পারে, কিন্তু হকির মত পা দিয়ে বল মারতে পারে না। কোনওরকম নিয়ম ভঙ্গ না করে বল গোলের ভিতর ঢুকলেই গোল হয়।

যেহেতু হিন্দুস্থান বল হাতেই অধিকাংশ সময় খেলা হয়, তাই এতে 'কিক্' নেই। সবই 'থ্রো'। যেমন—গোলের পর বা কর্ণার হলে সেণ্টার-থ্রো করতে হয়। সাইড-লাইন দিয়ে বল বাইরে গেলে সাইড-থ্রো। গোলপোস্টের উপর বা পাশ দিয়ে বল গেলে আউট-থ্রো। পেনাল্টি হলে পেনাল্টি-থ্রো, ফাউল থেকে যে থ্রো দেওয়া হয়, সেটি ফাউল-থ্রো।

অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে মনে করেন যে হিন্দুস্থান বল আর 'হায়দ্রাবাদ বল' একই খেলা। মোটেই তা নয়। শেষের খেলাটির নিয়ম-কানুন আলাদা। ওতে হাত দিয়ে খেলা হলেও বল মাটি থেকে ১ ফুটের বেশি উঁচুতে তোলা নিষিদ্ধ।

থো বল

সরঞ্জাম ও কোর্ট : কোর্টের দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট। দরকার ৫ নম্বর একটি ফুটবল। মাঠকে আড়াআড়ি দু'-ভাগ করে জাল টাঙানো হয়। খুঁটি পুঁততে হয় কোর্টের বাইরে ১২ ইঞ্চি দূরে। জাল উঁচু হবে ৬ ফুট। জালের দু'দিকে উভয় কোর্টে জাল থেকে ৩ ফুট দূরে লাইন টানা হয় আড়াআড়ি। উভয় দিকে এটি নিরপেক্ষ এলাকা।

খেলোয়াড় ও তাদের অবস্থান : প্রত্যেক দলে ৯ জন থাকবে। তারা কোর্টে দাঁড়ায় তিন সারিতে। প্রত্যেকের সামনে ও পিছনে নম্বর থাকবে। খেলোয়াড়রা দাঁড়ায় এইভাবে :—

১	২	৩
৪	৫	৬
৭	৮	৯

প্রতিটি গেমে অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। গেম শেষ হলে অন্য অবস্থানে যাওয়া যায়। ভলিবলের মত না হলেও একই গেমে অবস্থান বদলের নিয়ম আছে।

খেলার পদ্ধতি : শুরুতে ৯ নম্বর খেলোয়াড় সার্ভিস করে কোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে। সে বল ছোঁড়ে বিপক্ষের কোর্টে। বিপক্ষ খেলোয়াড়রা বল ধরে আবার বিপরীত কোর্টে ছুড়বে। কেউ বল ধরায় ব্যর্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত এইভাবে খেলা চলবে। যদি রিসিভ-কারীরা ব্যর্থ হয় তবে সার্ভিসকারীরা ১ পয়েন্ট অর্জন করবে। কিন্তু সার্ভিসকারী দল বল লুফতে ব্যর্থ হলে কেউ পয়েন্ট পায় না। তখন বিপক্ষ সার্ভিসের সুযোগ পাবে। সার্ভিসকারী দল বল লুফতে ব্যর্থ হলে পরক্ষণেই ৯ নম্বর চলে যাবে ১ নম্বরের জায়গায় এবং ৮ নম্বর খেলোয়াড় ৯ নম্বরের জায়গা দখল করে—এইভাবে প্রত্যেকে

একে অন্যের জায়গায় চলে আসে। রিসিভকারী দলের স্থান কিন্তু পরিবর্তন হয় না।

খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—কেউ নিরপেক্ষ অঞ্চলে গিয়ে বল ধরতে পারে না। বল ওই অঞ্চলে পড়লে তা আউট গণ্য হবে।

১৫ পয়েণ্টে একটি গেম হয় এবং খেলার মীমাংসা হবে ৩ গেমে। তবে উভয় দলের ১৪ পয়েণ্ট হলে সার্ভিসকারী দল 'ডিউস' ডাকবে; জেতার জন্য সার্ভিসকারী দলকে উপর্যুপরি ২টি পয়েণ্ট পেতে হবে। তা না হলে বা বিপক্ষ সার্ভিসের সুযোগ পেলে তারাও 'ডিউস' ডাকবে। তাদেরও জিততে উপর্যুপরি ২ পয়েণ্ট পেতে হবে। তা না হলে যে কোনও দলের অনুরূপভাবে ২ পয়েণ্ট পাওয়া পর্যন্ত খেলা চলবে।

দণ্ড: বল হাতে নিয়ে চলাফেরা করা যাবে না। তবে যে কোনও খেলোয়াড় লাফিয়ে উঠে বল ছুঁড়তে পারে বিপক্ষ কোর্টে। কিন্তু মাটিতে পা পড়ার আগেই যেন বল ছোঁড়া শেষ হয়। কোনও খেলোয়াড় 'ডাবল টাচ্' করতে পারে না। সার্ভিসকারীরা ডাবল টাচ করলে সার্ভিস হারায়। রিসিভকারীরা তা করলে সার্ভিসকারীরা ১ পয়েণ্ট পায়। মাটিতে বল পড়লেই খেলা শেষ হয়।

সার্ভিস যদি নেট স্পর্শ করে, তা হলে 'নেটবল' হবে এবং বিপক্ষ সার্ভিস করবে। তবে রিটার্ণ দেওয়ার সময় নেটে লাগলে 'নেটবল' হয় না।

একই সঙ্গে ছু'জন বল স্পর্শ করতে পারে। তবে একজন সঙ্গে সঙ্গে বল ছেড়ে দেয়। পা বা শরীরের অন্য কোনও অংশ দিয়ে বল থামানো যায় না। কেবল হাত ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে ফাউল হবে ও বিপক্ষ পয়েণ্ট পাবে।

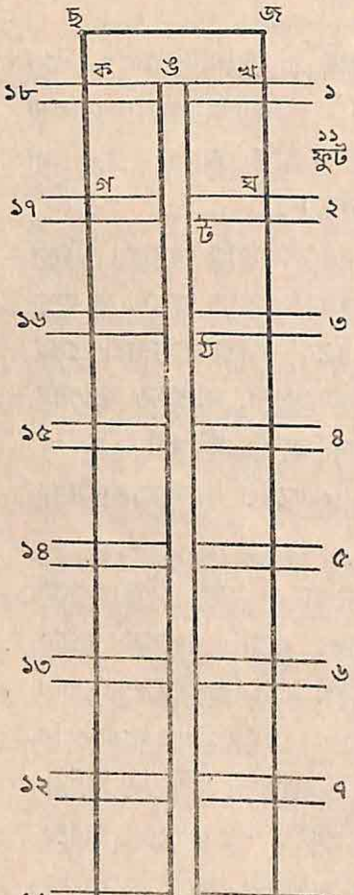
দাড়িয়াবান্ধা

এটি সম্পূর্ণ ভারতীয় খেলা। মহারাষ্ট্র বা পশ্চিম-ভারতে একে বলা হয় 'আতা পাতা' বা 'আত্যা পাত্যা'। কোনও কোনও জেলায় এটি 'গাদী' নামে পরিচিত। 'দাড়িয়াবান্ধা'র আইন-কানুন বা খেলার পদ্ধতির সঙ্গে 'গাদী'-র মিল অনেক।

এই খেলায় প্রতি দলে ৯ জন করে খেলোয়াড় থাকে। টসে বিজয়ী দলের অধিনায়ক স্থির করে তারা আক্রমণ করবে, না রক্ষা করবে। দাড়িয়াবান্ধায় যে ক'টি দুর্গ থাকে আক্রমণকারীরা সেই দুর্গগুলি আক্রমণ করে। একটি দুর্গ আক্রমণ বা অতিক্রম করলেই আক্রমণকারীরা ১০ পয়েন্ট পায়। 'লোনা' হলেই ৯টি দুর্গ ৯×২= ১৮ বার অতিক্রান্ত হয়েছে ধরে নিয়ে ১৮০ পয়েন্ট আক্রমণকারীদের অনুকূলে যায়।

সাত মিনিট করে একটি ইনিংস খেলা হয়। তবে আক্রমণকারী দলের অধিনায়ক তার আগেই ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারে। প্রতি ইনিংসের শেষে ৫ মিনিট বিশ্রাম বা বিরতি দেওয়া হয়। খেলা হবে মোট তিন ইনিংস দল-বদল করে। তিন ইনিংসে যারা বেশি পয়েন্ট পাবে, তারাই বিজয়ী হয়। সমান পয়েন্ট হলে অতিরিক্ত ইনিংস খেলাই রীতি। আবার কোনও দলের স্কোর যদি বিপক্ষের চাইতে ১৮০ পয়েন্ট বেশি হয়, তবে তারা কম পয়েন্টের দলকে ফলো-অন করায়। আক্রমণকারীরা সম্মুখ-দুর্গ ও বাউণ্ডারি-লাইনের মধ্যবর্তী এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকে। রক্ষকদলের খেলোয়াড়রা নিজ নিজ দুর্গে (৯ জন ৯টি দুর্গে) দাঁড়িয়ে থাকে সম্মুখ-দুর্গের দিকে মুখ করে। 'সুর' বা গ্রেনেডার কেন্দ্রীয় দুর্গে দাঁড়ায় স্কোয়ার-কাট বা স্পর্শের জন্য। সংকেতের সঙ্গে সঙ্গেই সে স্কোয়ার-কাট করে। স্কোয়ার-কাট না করলে কোনও আক্রমণকারীকে সে আউট করার অধিকার পায় না।

অন্যান্য রক্ষকরা নিজ নিজ দুর্গের যে-কোনো দিকে গিয়ে আক্রমণকারীদের বাধা দিতে পারে।



দাড়িয়াবান্ধার কোর্ট

খেলার মাঠ বা কোর্ট : (ছবি দ্রষ্টব্য) ৯টি আড়াআড়ি লাইনকে (২৩ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা ও ১৩ ইঞ্চি চওড়া) বলা হয় ৯টি দুর্গ বা পাতি। কোর্ট বা মাঠটিকে লম্বালম্বি দু'ভাগ করার মত যে লাইন বা পথ (৮৯ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা ও ১৩ ইঞ্চি চওড়া), তাকে বলা হয় 'কেন্দ্রীয় দুর্গ' বা সুর-পাতি। এই কেন্দ্রীয় দুর্গ ই ৯টি দুর্গকে আধাআধি ভাগ করে। সংলগ্ন দু'টি সম্মুখ-লাইনের (খ ঘ) দূরত্ব থাকে ১১ ফুট। আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি দুর্গের সংযোগস্থলে ১৩ ইঞ্চি করে বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়। সামনের দুর্গ ও পিছনের দুর্গের সমান্তরাল দু'টি লাইন টানা হয় ১১ ফুট দূরে। এই দু'টি (ছ জ ও ঝ ঞ) শেষ লাইন। সাইড-লাইনগুলি শেষ লাইনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। যে দু'টি লাইন দ্বারা দুর্গকে চেনা যায়, প্রতি দুর্গের সেই দু'টি লাইন সাইড-লাইনের বাইরে অতিরিক্ত তিন ফুট বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সমগ্র মাঠে বা কোর্টে ১০ ফুট করে খালি জায়গা যেন অবশ্যই থাকে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক খেলোয়াড়ঃ যাদের বয়স ১৫ বছর হয়নি বা যাদের উচ্চতা ৫ ফুটের কম, তারাই অপ্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে পড়ে। এদের ক্ষেত্রে কোর্টের মাপ হবে আড়াআড়ি ২১ ফুট লম্বা ও ১ ফুট চওড়া। সামনের লাইন থেকে সংলগ্ন দুর্গের দূরত্ব ১০ ফুট। কেন্দ্রীয় দুর্গ ৮১ ফুট × ১২ ইঞ্চি।

সংজ্ঞা

সম্মুখ-দুর্গঃ সামনের বা প্রথম দুর্গকে বলে 'ছাম্বার পাতি' বা 'কাপাল পাতি'। সকলের পিছনের দুর্গকে 'লোনা পাতি' বলা হয়।

স্কোয়ারঃ কেন্দ্রীয় দুর্গ প্রতিটি কোর্টকে দু'ভাগে ভাগ করে এবং প্রতিটি ভাগকে স্কোয়ার বলা হয়।

দুর্গ-রক্ষকঃ যারা দুর্গে দাঁড়িয়ে 'আক্রমণকারী'দের দুর্গ-অতিক্রমে বাধা দেয় বা তাদের কোর্ট থেকে আর এক কোর্টে যাওয়ার সময় ছুঁয়ে 'আউট করে', তারাই 'রক্ষক'। এদের 'পাতিওয়াল'ও বলা হয়।

সুরঃ যে খেলোয়াড় সম্মুখ ও কেন্দ্রীয় দুর্গ রক্ষা করে, তাকে 'গ্রেনেডার' বা 'সুর' বলা হয়।

দণ্ডঃ যদি রক্ষকদের বা 'সুর'-দের দেহের কোনও অংশ নিজ নিজ দুর্গের লাইনের বাইরে স্পর্শ করে, তবে 'ফুট ফল্ট' হবে এবং রক্ষক-দের পা বাদে অন্য কোনও অংশ মাটি ছুঁলে 'হ্যাণ্ড ফল্ট' হবে। আক্রমণকারীরা কখনও বাউণ্ডারির বাইরের মাঠ ছুঁতে পারবে না, তাহলে 'ফুট আউট' হবে।

স্কোয়ার-কাটঃ ইনিংসের শুরুতে সুর বা গ্রেনেডারকে পা বা পা-র অংশ অবশ্যই সম্মুখ-দুর্গের স্কোয়ারের উপর রাখতে হয়। প্রতিবারই তাকে খেলার সময় একই পা দিয়ে স্কোয়ার ছুঁতে হয়। একেই স্কোয়ার-কাট করা বলে।

টোও দেওয়া : যখন কোনও আক্রমণকারী পিছন দিক থেকে সম্মুখের দুর্গে যাওয়ার জন্য দুর্গ পুনরায় অতিক্রম করে, সেই আক্রমণকারী রক্ষকদের পিছনে দাঁড়িয়ে 'টোও' বলে চীৎকার করে। রক্ষক সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দুর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। একেই 'টোও' দেওয়া বলা হয়।

টোও দেওয়া-নেওয়া : যখন কোনও আক্রমণকারী সম্মুখ-দুর্গ থেকে পিছনের দুর্গের দিকে যায় ও পিছনের দুর্গ থেকে আর এক আক্রমণকারী সম্মুখ-দুর্গের দিকে আসে, এমন অনেক সময় দুই আক্রমণকারীতে কোনও স্কোয়ারে দেখা হয়। তখন সম্মুখ-দুর্গগামী খেলোয়াড় 'টোও পাওয়া গেল' জানায়।

লোনা : যখন প্রথম আক্রমণকারী পিছনের দুর্গ অতিক্রমের পর আবার সম্মুখ-দুর্গে ফিরে আসে তখনই তারা রক্ষকদের বিরুদ্ধে 'লোনা' পায়।

পরিচালক : দাড়িয়াবান্ধার ম্যাচ পরিচালনার জন্য ১ জন রেফারী, ৯ জন আম্পায়ার, ১ জন স্কোরার ও ১ জন মার্কার প্রয়োজন। আম্পায়াররা প্রতিটি দুর্গের দিকে লক্ষ্য রাখেন। রেফারী খেলা শুরু ও শেষ করেন। স্কোর ঘোষণা করেন। স্কোরার দেখেন কোন্ আক্রমণকারী আউট হয়।

ট্যাগ গেমস্ বা অনুসরণের খেলা

চুন দিয়ে একটি সীমানা আঁকা হয় মাঠে। ৩০ থেকে ৫০ জন খেলোয়াড় সীমানার মধ্যে (৪০ ফুট × ৪০ ফুট) ছড়িয়ে থাকে। যাকে 'অধিনায়ক' নির্বাচিত করা হয়, সে ছুটে ছুটে যে-কোনও একজনকে ছুঁয়ে দিয়ে নতুন অধিনায়ক করে। পুরনো অধিনায়ক তখন অন্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। নতুন 'অধিনায়ক' আর একজনকে ছুঁয়ে অধিনায়ক করে। এইভাবে খেলা চলে। **এটি সাধারণ ট্যাগ গেম বা অনুসরণের খেলা।**

হুইপ ট্যাগ: এটিও সাধারণ ট্যাগের অনুকরণে খেলা হয়। তবে দৌড়ে অন্যের পিছনে ছুটে ছুঁয়ে বা চাবুক দিয়ে সামান্য আঘাত করতে হয়। অধিনায়ক বা যার হাতে চাবুক থাকে, সে অন্যকে মেরেই চাবুক মাঠে ফেলে বাকি খেলোয়াড়দের সঙ্গে যোগ দেয়।

হপিং ট্যাগ: অধিনায়ক এক পায়ে ছুটে অন্যকে ছুঁয়ে নতুন অধিনায়ক তৈরি করে।

রিলে গেমস্

অ্যাথ্‌লেটিকসের বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে অন্যতম রিলে দৌড়। ব্যাটন পরিবর্তনের দ্বারা চারজন খেলোয়াড় দৌড় শেষ করে। আরম্ভ-লাইন বা স্টার্টিং-লাইন থেকে এক-একটি দলের একজন দৌড় শুরু করে পরবর্তী বাঁকে দাঁড়িয়ে-থাকা নিজ দলের দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে ব্যাটন দেয়—দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে, তৃতীয়জন চতুর্থজনকে এবং চতুর্থজন গন্তব্যস্থলে বা ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছায়। আগে যে বা যে-দলের খেলোয়াড় পৌঁছায়, তারাই বিজয়ী ঘোষিত হয়। **একে সাধারণ রিলে বলে।**

খাদ বা পরিখা রিলে: এই রিলেতে প্রতিটি বাঁকে কৃত্রিম খাদ বা পরিখা তৈরি করা হয় ১.৮৩ মিটারের। প্রত্যেককে ওই খাদ লাফিয়ে অতিক্রম করতে হয়। সাধারণ রিলের সাথে এর পার্থক্য শুধু ওই খাদ।

উঁচু লাফ: রিলে দৌড়ে দু'জনের মধ্যবর্তী পথে দড়ি বা কাঠ দিয়ে উচ্চতা সৃষ্টি করা হয়, প্রত্যেকে ওই বাধা লাফিয়ে অতিক্রম করে।

দৌড় ও ছোঁড়া: এই রিলেতে প্রত্যেকের ব্যবধান থাকে ৬.১০ মিটার। প্রথম জন সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল, ভলিবল বা বাস্কেটবল নিয়ে ওই পথ অতিক্রম করে পিছনে ঘুরে স্টার্টিং বা শুরুর লাইনের দিকে তাকায় এবং ওই অবস্থায় পিছনে বল ছোঁড়ে দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের কাছে। সে বল নিয়ে আবার ৬.১০ মিটার দৌড়য় এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে শুরুর লাইনের দিকে ফিরে পিছনে বল ছোঁড়ে। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রত্যেকেই অনুরূপ করে। তবে বল কোনও কারণে মাটিতে পড়লে শুরুর লাইনের দৌড়কারী বল কুড়িয়ে আবার দৌড় শুরু করবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাঠি

এটি সম্পূর্ণ ভারতীয় খেলা। এ শুধু দম ও ক্ষিপ্রতা বাড়ায় না, শরীরের অপ্রয়োজনীয় মেদও দূর করে। শরীর কর্মঠ, সুস্থ এবং সবল করে গড়ে তুলতে লাঠি খেলা অপরিহার্য। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের সর্বত্র লাঠি খেলা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। অবিভক্ত বাংলায় এর পুরোধা ছিলেন বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস। শহরে-গ্রামে অসংখ্য গুপ্ত-সংঘে তিনি লাঠি খেলার প্রবর্তক ছিলেন। শেষ-জীবনে কলকাতায় বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নানা কারণে ওই সমিতি বর্তমান থেকেও আজ লাঠি-খেলা চর্চা অবলুপ্তির পথে। তবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের নানা অনুষ্ঠানে আত্মরক্ষামূলক লাঠি-খেলার প্রদর্শনী আজও অব্যাহত।

লাঠি নানা প্রকারের : যথা—**বেনেটি, বড় লাঠি রং খেলা বা হাড়ুয়া, বেনা বা বেনথ, বড় লাঠি খেলা, ছোট লাঠি রং খেলা।**

বেনেটি : এই লাঠির দুই প্রান্তে ছোট বল জোড়া থাকে। বিভিন্নভাবে পর্যায়ক্রমে দু'হাতে এই লাঠি ঘোরানো হয়। কথিত আছে, পুরাকালে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়লে সংশ্লিষ্ট সৈন্য আত্মরক্ষার জন্য বেনেটির দু'দিকে আগুন জ্বালিয়ে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে আসত। একে অগ্নিবেনেটি বলা হয়।

হাড়ুয়া বা বড় লাঠি : লাঠির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা হাড়ুয়া বা বড় লাঠি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নানা পদ্ধতিতে বড় লাঠি খেলা হয়ে থাকে। বড় লাঠির দৈর্ঘ্য হবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ডান পা-র মাটি থেকে ডান হাত উঁচু করে দাঁড়ালে মধ্যমা যতদূর যায়, ততখানি। প্রত্যেকে নিজ নিজ উচ্চতা অনুযায়ী লাঠি ব্যবহার করে। লাঠি হবে বাঁশের। এই বাঁশ পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় না। অবশ্য, কলকাতায় বড়বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

স্কাউটরাও এই ধরনের লাঠি ব্যবহার করে। এই বাঁশের লাঠি ফাঁপা থাকে না।

লাঠি ধরা : লাঠির প্রান্তভাগ থেকে ১ হাত পরিমাণ ছেড়ে ডান হাতে ধরতে হয়, সেখান থেকে আর ১ হাত দূরে বাঁ হাতে ধরতে হবে। ঘোরাবার পদ্ধতি নানা প্যাঁচের। যথা : **অনুলোম, বিলোম, সম্মুখ পৃষ্ঠবেষ্টন, শিরাবেষ্টন** ইত্যাদি। জটিল প্যাঁচগুলি—**যমক, যমকাবর্তন, উগ্র যমকাবর্তন, ত্রয়ী, ত্রিবর্ত, উৎকট, চমক, ত্রন্ধাবর্তন, ভাঙ্গকরণ, মিত্রমণ্ডল** প্রভৃতি। শুরুতে এসব দাঁড়িয়ে অভ্যাস করতে হয়। তারপর নড়ে-চড়ে বা অবশেষে লাফিয়ে লাফিয়ে লাঠি খেলা উন্নত-মানের খেলোয়াড়ের পরিচায়ক।

বড় লাঠি রং খেলা : হাড়ুয়া বা বড় লাঠি আয়ত্তে এলেই বড় লাঠি রং খেলা আয়ত্ত করা যায়। এই খেলায় এক পক্ষ মারতে গেলে বিপক্ষ খেলোয়াড় তা প্রতিরোধ করে। এই খেলা শুরুর আগে গড়াপেটা করে নিতে হয় কে কী করবে। এর বিভিন্ন আঘাত—**ঘাত, বিঘাত, শ্যামঘাত বা সমঘাত**। বিভিন্ন জায়গায় আঘাতকে বলা হয় **শির, তাম্বেচা, বাহেরা, ডাণ্ডার, কটি, মন, দে, পালটি, কড়ক, হুল**।

বড় লাঠি ছুট্ বা ফ্রী-ফাইট : বড় লাঠি রং খেলায় যারা চৌকস, তারাই ফ্রী-ফাইট করতে পারে। এতে গড়াপেটার ব্যাপার থাকে না। উভয়পক্ষে নকল লড়াই হয় না। কেউ বিধি-নিষেধ মানে না। তবে যে খেলোয়াড় বিপক্ষকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে, সে-ই বিজয়ী হয়।

ছোট লাঠি : ছোট লাঠির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ খেলোয়াড়ের নিজের দুই হাত ও আট আঙুলের সমান হবে। এর যেদিকটা ধরা হয় সেদিক কিছুটা মোটা ও অগ্রভাগ সরু থাকে। এক হাতে এই লাঠি ধরতে হয়, তা না হলে বড় লাঠির মতই আঘাতে ও প্রতিঘাতে নানা নিয়ম পালন করা হয়।

জুডো

জুডো আমাদের দেশে জুজুৎসু নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান ভ্রমণকালে এই আত্মরক্ষামূলক খেলা তথা শরীর-চর্চার বিষয়টিতে আগ্রহী হন। শান্তিনিকেতনে তিনি জুজুৎসু প্রচলন করেন। ১৯০৫ সালে সালো আন্ নামে এক জুজুৎসু-বীর শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসেন। এরপর কবিগুরু ১৯২৪ সালে জাপান সফরে গিয়ে জুডো বা জুজুৎসুর প্রতি আরও আকৃষ্ট হন। জাপানে অবস্থানকালে শান্তিনিকেতনে জুডো প্রচলন সম্পর্কে আলোচনাও করেন এবং ১৯২৯ সালে পুজোর সময় লোক্‌জো তাগাকাকি সান্ শান্তিনিকেতনে আসেন এবং দু' বছর অবস্থান করেন। গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল বাংলার মেয়েরা আত্মরক্ষার এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করুক। কারণ, তখন বাংলাদেশে নারী-নির্যাতন ও অপমান নিত্যকার ঘটনা। বাঙালি 'দুর্বৃত্তদের হাত হইতে আত্মরক্ষার এই সহজ অস্ত্রটি আনন্দে গ্রহণ করিবে ইহাই ছিল কবির আশা।'

জাপানে অবশ্য জুডো খেলোয়াড়রা (জুডোকা) খেলা হিসাবেই এটি অনুশীলন করে। তারা জুডো খেলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্যে।

অনেকের মতে জুডো এসেছে চীন থেকে। কিন্তু ১৮৮২ সাল থেকে জাপানে এর প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং তার মূলে ছিল ডাঃ জিগোরা কানো-র প্রচেষ্টা। জুডো-র প্রথম বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা হয় ১৯৫৬ সালে। কৃতিত্ব অনুযায়ী জুডো খেলোয়াড়দের দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক গ্রুপে থাকে :

গোকিয়ু	৫ম কিয়ু	সাদা বেল্ট
য়োনকিয়ু	৪র্থ কিয়ু	সাদা বেল্ট
সান্‌কিয়ু	৩য় কিয়ু	হলুদ বেল্ট
নিকিয়ু	২য় কিয়ু	হলুদ বেল্ট
ইক্কিয়ু	১ম কিয়ু	হলুদ বেল্ট

ইক্কিয়ুপ্রাপ্তরা প্রাথমিক গ্রুপের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

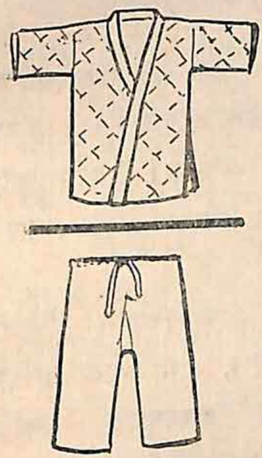
সিনিয়র গ্রুপের খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকে :

সেডান	১ম ডান	কালো বেল্ট
নিডান	২য় ডান	কালো বেল্ট
সানডান	৩য় ডান	কালো বেল্ট
য়োনডান	৪র্থ ডান	কালো বেল্ট
গোডান	৫ম ডান	কালো বেল্ট
রোকুডান	৬ষ্ঠ ডান	লাল ও সাদা বেল্ট
সিচিডান	৭ম ডান	লাল ও সাদা বেল্ট
হাচিডান	৮ম ডান	লাল ও সাদা বেল্ট
কিয়ুডান	৯ম ডান	লাল বেল্ট
জুডান	১০ম ডান	লাল বেল্ট

এ পর্যন্ত মাত্র সাতজন ১০ম ডান পেয়েছে। ১১শ (জুইচিডান) ও ১২শ (জুনিডান) ডান এ পর্যন্ত কেউ পায়নি। একাদশ ডানপ্রাপ্তদের জন্যে লাল বেল্ট ও দ্বাদশ ডানপ্রাপ্তদের জন্যে দ্বিগুণ চওড়া সাদা বেল্টের ব্যবস্থা আছে।

জিমন্যাসিয়াম বা 'ডোজো' : জাপানী ভাষায় জুডোর জিমন্যাসিয়াম বা যেখানে জুডো খেলা হয়, তাকে 'ডোজো' বলে। এই ডোজো ৩×৬ ফুট আকারের গদী দিয়ে মোড়া থাকে। ডোজোর আকৃতি অনুযায়ী ২৪ থেকে ৫০টি গদী পাততে হয়। তবে বড় প্রতিযোগিতায় ৫০টি গদী অবশ্যই প্রয়োজন। কলকাতার ময়দানে গুরু নানক সরণীতে 'ক্যালকাটা জুডো ক্লাবে' অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। জুডো খেলোয়াড়রা খালি পায়ে খেলে। পোশাক এমন হবে, যেন কব্জি থেকে হাত পর্যন্ত খোলা থাকে। গোড়ালি থেকেও উপরে প্রায় ছয় ইঞ্চি অনুরূপ আলগা রাখা হয়। কোমরে জিন কাপড়ের বেল্ট এবং জিন কাপড়ের জ্যাকেট পরতে হয়। (পর-পৃষ্ঠার ছবি দ্রষ্টব্য)। পা ও হাতের নখ ছোট করে কাটতে হবে। পোশাক, গদী

সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। লাঠির মত জুডোও উপযুক্ত কোচের



জুডোর পোশাক



পোশাক পরে জুডোকা

কাছে হাতে-কলমে না শিখলে প্যাঁচগুলি আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়।

সাধারণ ট্রেণিং নিম্নরূপ ঃ

ক) ক্যালিস্থেনিকস্—পেশীর উন্নতি ও গা ঘামিয়ে নেওয়ার ব্যায়াম।

খ) উকেমি—আছাড় খাওয়ার ব্যায়াম।

গ) উচিকোমি—বিভিন্ন কৌশল আয়ত্তে আনা ইত্যাদির জন্য ব্যায়াম।

ঘ) বান্দোরী—এবার আর এক-জনের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে আত্মরক্ষা করার জন্যে বা বিপক্ষকে ছুঁড়ে ফেলতে।



জুডোর আছাড় (উকেমি)

'পশ্চিমবঙ্গ জুডো অ্যাসোসিয়েশন' প্রাথমিক পর্যায়ে খেলোয়াড়দের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ দেন :

গোকিয়ু (সাদা) : চরিত্রবান ও বিনয়ী হতে হবে।

সান্‌কিয়ু (হলুদ) : (ক) চরিত্রবান, (খ) নিয়মিত অনুশীলন ও উপস্থিতি।

সাধারণ জ্ঞান : (ক) জুডোর জন্যে প্রচলিত আদব-কায়দা রপ্ত করতে হবে। (খ) জুডোয় পরিচ্ছন্নতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ সম্পর্কে প্রচলিত সব কিছু মানতে হবে। (গ) আছাড় (উকেমি) খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং (ঘ) নির্ভুলভাবে বসা, দাঁড়ানো, হাঁটু গেড়ে বসা ইত্যাদি নিপুণভাবে শিখতে হবে।

এ ছাড়া আঁকড়ে ধরা (কুমিকাটা), অঙ্গবিন্যাস (শিসেশি), স্বাভাবিক অঙ্গবিন্যাস (জিগোহেনেতাই), ডান দিকে রক্ষণমূলক অঙ্গবিন্যাস (সিজেনতাই), বাঁ দিকে রক্ষণমূলক অঙ্গবিন্যাস (জিগোতাই) ইত্যাদিতে মৌলিক জ্ঞান রপ্ত করতে হবে।

জেনে রাখতে হবে ছুঁড়ে ফেলবার মৌলিক বিষয়গুলি। যথা—বিপক্ষের ভারসাম্যে আঘাত (কুজুশি), বিপক্ষকে ছুঁড়ে ফেলবার আগে নিজেকে যথার্থভাবে রাখা (শুকুরি) এবং অবশেষে ছোঁড়া (কাকে)।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লোক-নৃত্যের পরিচিত সংগীত

(ছাত্রদের জন্য)

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোক বনের রাঙা নেশায় রাঙি।
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই—আমরা বিদ্যুৎ॥
আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে জীবন-মরণ-ঝড়ে আমরা প্রস্তুত॥

রায়বেঁশে

ওগো রাধা গোকুলেতে থাকি
তোমার লাগি পরের মাকে
আমি মা বলিয়া ডাকি গো।
কুল দিলাম মান দিলাম
আর আছে কী বাকি
তোমার লাগি ব্রিজপুরে আমি
মুরলী শিখি গো।

কাঠি

দেহ জমিন আবাদ হৈল না,
চৌদ্দ পোয়া জমিন ছিল
ভূকম্প তা ভাইঙ্গা নিল
নক্‌শা বন্দি কিছুই রইল না;
আমার সদর খাজনা ফাজিল গেল
চেক দাখিলা পাইলাম না।

সমবেত ও দেশাত্মবোধক সংগীত

(ছাত্র ও ছাত্রী)

(১) হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নতশির, নাহি ভয়। ...ইত্যাদি

—অতুলপ্রসাদ সেন

(২) বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্...ইত্যাদি

— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৩) আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক
ফিরবো না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার।
...ইত্যাদি

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে॥

যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে ॥
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫) সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ ॥
....ইত্যাদি
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি।
আহা, হাহা, হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি ॥
…ইত্যাদি
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭) আমাদের ভয় কাহারে।
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের করতে পারে ॥
…ইত্যাদি
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮) ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
…ইত্যাদি
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(৯) আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু'-বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥
…ইত্যাদি
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোক-নৃত্যের পরিচিত সংগীত
(ছাত্রীদের জন্য)

(১) খর বায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইও।
তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
শৃঙ্খলে বারবার ঝন্ঝন্ ঝঙ্কার, নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার ;
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর, টলোমলো করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
গণি গণি দিন খন চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কি নাই যাই রে।'
সংশয়পারাবার, অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল ঝড়ে হয়ে লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল—জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥...

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২) পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে, আ য় আ য় আ য়,
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে, মরি হা য় হা য় হা য়।
হাওয়ার নেশায় উঠলো মেতে দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে ...ইত্যাদি

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩) চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্ চল্ চল্—

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাবো তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল,
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা আনিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চল্‌রে নওজোয়ান
শোন্‌রে পাতিয়া কান,
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান,
ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল,
চল্‌রে চল্‌রে চল্—
চল্ চল্ চল্।

—কাজী নজরুল ইসলাম

(৪) ফুল বলে, ধন্য আমি, মাটির 'পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে॥ ...ইত্যাদি

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫) হ'ল মাটিতে চাঁদের উদয় কে দেখবি আয়,
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নাই—দেখ্‌সে নদীয়ায়।
তোরা কে দেখবি আয়,
তোরা কে দেখবি আয়।
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নাই—
দেখ্‌সে নদীয়ায়। ...ইত্যাদি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ক্যাম্পিং ও হাইকিং

ক্যাম্পিং : বিশ্বকবি লিখেছেন 'আমি চঞ্চল হে, সুদূরের পিয়াসী।' সত্যিই তাই। মানুষ সুখে-শান্তিতে বাস করতে চাইলেও তার মনের মধ্যে একটা যাযাবর বাস করে, যা তাকে ঘরছাড়া করে নিয়ে বেড়ায়। তখন পরিচিত পরিবেশ ও পরিজনদের ফেলে মানুষ বেরিয়ে পড়ে দূর দেশে ভ্রমণ করতে। ক্যাম্পিং, হাইকিং ও পর্বতারোহণ মানুষের এই ভ্রমণ-পিপাসা মেটায় বিভিন্নভাবে। শরীর-গঠন, নিয়মানুবর্তিতা, একত্রে মিলে মিশে কাজ করার অভিজ্ঞতা, ধীর শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে লক্ষ্যের দিকে সুচিন্তিতভাবে এগিয়ে যাওয়া, দলের প্রতি আনুগত্য, পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, বিচিত্র প্রকৃতির নানা রূপের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, অজানাকে জানার আনন্দ ইত্যাদি অনেক কিছুই শেখা যায় বা লাভ করা যায় ক্যাম্পিং, হাইকিং এবং বিশেষ করে পর্বতারোহণের মাধ্যমে। এই তিনটির মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ক্যাম্পিং। কারণ, যে-কোনও ব্যাপারেই—হাইকিং বা পর্বতারোহণে ক্যাম্পিং দরকার। ক্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে একাধারে শিক্ষালাভ এবং অবসর-বিনোদন উভয়ই সম্ভব হয়।

নগরবাসী বা শহরবাসী চিরকাল নগরের আবহাওয়ায় বাস করতে পারে না; মাঝে মাঝে পল্লী-প্রকৃতির শ্যামলিমায় ছুটে যায় এবং সেখানে ক্যাম্প বা তাঁবু খাটিয়ে দু'চারদিন কাটিয়ে আসে। একে বলে 'ক্যাম্পিং'। আর, কোথাও ক্যাম্প করার পর সেখান থেকে কিছু দূর বেড়িয়ে আসাকে বলে 'হাইকিং' বা পদযাত্রা।

কীভাবে প্রথম ক্যাম্পিংয়ের শুরু, তা বলা শক্ত। মনে হয় অতীতে কয়েক লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ কোনও গুহামানব কোনও একদিন পথ হারানোর পর শিকারে বধ-করা পশুর চামড়া

জোড়া লাগিয়ে তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করে নেয় এবং এইভাবেই ক্যাম্পিংয়ের গোড়াপত্তন হয়।

যাই হোক, আধুনিক ক্যাম্পিংকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে বয় স্কাউট আন্দোলন। 'বয় স্কাউট' বা 'ব্রতচারী'রাই ক্যাম্পিংকে জনপ্রিয় করেছে। ইংল্যাণ্ডে ১৯০৭ সালে এবং তার তিন বছর বাদে আমেরিকায় ব্রতচারী আন্দোলনের শুরু। তাঁবু ও সাজ-সরঞ্জামাদি প্যাক করে বোঝা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ত বয় স্কাউটরা শহর থেকে দূরে এবং পছন্দমত জায়গায় ক্যাম্প খাটিয়ে কিছুদিন বাস করত। আজকাল অবশ্য বয় স্কাউট ছাড়াও বহু লোক নিছক আনন্দ ও অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পিং করে। ইংল্যাণ্ডে 'ক্যাম্পিং ক্লাব অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডে'র সদস্য-সংখ্যা ৫০,০০০-এরও বেশি। এই ক্লাব ক্যাম্পিং করার উপযোগী সহস্রাধিক জায়গার বা 'ক্যাম্প-সাইটের' রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং ক্যাম্পারদের সুবিধার জন্য তাদের জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সরবরাহ করে। ভারতে দিল্লীতে 'ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাণ্ড ক্লাব' নামে একটি ক্যাম্পিং ক্লাব আছে।

সুন্দর জায়গায় মুক্ত আবহাওয়ায় ক্যাম্প খাটিয়ে থাকার মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে তার স্বাদ একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। বেশ বড় দল গেলে সাজ-সরঞ্জামাদি বেশি হয়, ক্যাম্পিং হয় 'হেভি ওয়েট'। চার বা পাঁচজন গেলে 'মিডল্ ওয়েট' ক্যাম্পিং এবং ২ জন গেলে 'লাইট ওয়েট' ক্যাম্পিং হয়। অবশ্য এ-বিষয়ে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। অল্প খরচে অফুরন্ত আনন্দ যে-কোনও রকমের ক্যাম্পিংয়েই পাওয়া যায়।

ক্যাম্পিংয়ে তাঁবু খাটানোর ব্যাপারটা যখন আছেই তখন যারা ক্যাম্পিং করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রথমেই ভালভাবে শিখে নিতে হবে বিভিন্ন ধরনের তাঁবু কীভাবে খাটাতে হয়।

এ-ছাড়া রান্নার বিষয়েও ক্যাম্পারদের কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ, ক্যাম্পে তো আর কেউ না খেয়ে থাকবে না।

কাজেই অল্প পরিশ্রমে কিছু খাবার তৈরি করার জ্ঞান প্রায় প্রত্যেকেরই থাকা দরকার।

এবার দেখা যাক, ক্যাম্পিং করতে গেলে কী কী জিনিস নিয়ে যেতে হবে। গোটা বাড়ীটাকে কেউ বয়ে নিয়ে যেতে পারে না,—আবার এও দেখতে হবে যে, এমন এমন জিনিস নিয়ে যেতে হবে, যাতে ক্যাম্পিংয়ের সময় কোনও অসুবিধা না হয়।

প্রত্যেকের নিজের থাকবে	সকলের জন্যে থাকবে
১। ক্যাম্পে যাবার ও ক্যাম্প থেকে ফেরার সময়ের পোশাক	১। তাঁবু, খুঁটি ও গোঁজ
২। অতিরিক্ত পোশাক	২। প্লাস্টিকের বা পলিথিনের ব্যাগ ও বোতল
৩। জ্যাকেট বা সোয়েটার	৩। খাদ্যদ্রব্যাদি
৪। বর্ষাতি	৪। জলের বালতি (পলিথিনের)
৫। জুতো ও মোজা	৫। রান্নার হাঁড়ি বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু
৬। পাজামা, রাত্রির পোশাক	৬। সস্‌প্যান, ফ্রাইংপ্যান
৭। রুমাল	৭। স্টোভ বা প্রেসার-কুকার
৮। স্লীপিং-ব্যাগ বা কম্বল	৮। টিন কাটার যন্ত্র
৯। চাদর	৯। টেবল ক্লথ
১০। মশারি	১০। বাসনপত্রাদি পরিষ্কার করার পাউডার
১১। হাওয়া-ভরা বালিশ	১১। কুঠার (ছোট ও বড়)
১২। থালা, বাটি, কাপ	১২। ছুঁচ, সূতো, বোতাম, সেফ্‌টিপিন

প্রত্যেকের নিজের থাকবে	সকলের জন্যে থাকবে
১৩। ছুরি, কাঁটা, চামচ	১৩। দড়ি (নাইলনের)
১৪। সাবান	১৪। সরু তামার তার
১৫। ব্রাশ, মাজন	১৫। পেরেক
১৬। চিরুনি, আয়না	১৬। ফার্স্ট-এড বক্স্
১৭। তোয়ালে বা গামছা	১৭। আমোদ-প্রমোদের জন্য ট্রানজিস্টর রেডিও, ক্যামেরা। (এখানে তালিকা প্রয়োজন-বোধে অবশ্যই বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে।)
১৮। হাতঘড়ি	
১৯। দিয়াশলাই	
২০। টর্চ	
২১। পকেট ফার্স্ট-এড সরঞ্জাম	
২২। বড় ছুরি	
২৩। টাকা রাখার ব্যাগ	
২৪। নোটবুক, পেন্সিল বা পেন	
২৫। প্যাক করার জন্য ব্যাগ	
২৬। বাঁশী (হুইসল্)	

(এ-ছাড়া আরও অনেক জিনিসই নেওয়া যেতে পারে। এখানে কেবল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্য রাখতে হবে, এক-একজনের বোঝা যেন ১০ থেকে ১৫ কিলোগ্রামের বেশি না হয়। হলে যে বইবে তারই অসুবিধা।)

মনে রাখতে হবে, ক্যাম্পিং পিকনিকের মত শুধুই মজার ব্যাপার নয়। ক্যাম্পিং থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে। এ সম্পর্কে এই অধ্যায়ের শুরুতে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

হাইকিং ঃ ক্যাম্প ছেড়ে খানিকটা ঘুরে বেড়িয়ে আসাকে হাইকিং বলা হয়, এ-কথা আগে বলা হয়েছে। এই বেড়ানো সচরাচর হেঁটেই হয়; তবে সাইকেল, ঘোড়া বা নৌকায় চড়েও কেউ কেউ হাইকিং করে। তবুও হাইকিং প্রধানতঃ পদযাত্রাই। ক্যাম্প-জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এই হাইকিং। নানা কারণেই ক্যাম্পাররা দূরে অন্য

জায়গায় যেতে পারে—ভ্রমণ, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখা ইত্যাদি। হাইকিংয়ের সাজ-সরঞ্জাম আলাদা কিছু নয়। ক্যাম্প থেকে যাবার সময় কী কী জিনিস বাইরে নিয়ে যেতে হবে, সেটা নির্ভর করে বাইরে কতটা সময় থাকতে হবে তার উপর। সমতলভূমিতে হাইকিং করা যায়—তাকে বলে 'লো-ল্যাণ্ড হাইকিং'। আবার পাহাড়-পর্বতের উঁচুতে উঠেও ক্যাম্পাররা কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে পারে। দু'সপ্তাহের ক্যাম্পিংয়ে বার-দু'য়েক হাইকিং মন্দ নয়। তবে দেখতে হবে অতিরিক্ত পরিশ্রম যেন না হয়। বলা হয় যে, দিনে দশ থেকে বারো মাইল হাইকিং যথেষ্ট। তাও আবার গোড়াতেই নয়। একটু একটু করে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে হয়। কারণ, সকলেরই মাইলের পর মাইল হাঁটবার মত দম থাকে না। প্রথমে বারো-চৌদ্দ ঘণ্টার জন্য হাইকিং, তারপর এক রাত বাইরে কাটানো। তারপর দু'তিন রাত বাইরে কাটানো—এভাবেই হাইকিংয়ের আনন্দ ক্রমশঃ বাড়িয়ে নিতে হয়।

ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে গেলে ক্যাম্পারদের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা দরকার। যেমন, কারও সম্পত্তি অর্থাৎ শস্যক্ষেত্র প্রভৃতির ক্ষতি না করা, বিনা অনুমতিতে কারও এলাকায় প্রবেশ না করা, রাস্তা দিয়ে যাবার সময় অকারণে চীৎকার বা গণ্ডগোল না করা ইত্যাদি। হাইকিং শেষ করে ফিরে এসে বাসনপত্রাদি পরিষ্কার করতে হয় ও অন্যান্য জিনিস যথাস্থানে রেখে দিতে হয়।

ঠিক ক্যাম্পিং এবং হাইকিংয়ের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত না হলেও কলকাতার 'এক্সপ্লোরার্স ক্লাব' নানারকম অভিযান সংগঠিত করে। এর নাম উল্লেখ না করলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ, এক্সপ্লোরার্স ক্লাব পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে পরোক্ষভাবে ক্যাম্পিং ও হাইকিং এসে পড়ছে। ব্যারিস্টার মিহির সেন—যিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম ভারতীয় সাঁতারু—এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁরই উৎসাহে ও দক্ষ পরিচালনায় অসংখ্য

যুবক-যুবতী এই ক্লাবের সদস্য ও সদস্যা হয়ে একাধিক দুঃসাহসিক অভিযানে অংশগ্রহণ করছে।

ক্যাম্পিংয়ে সব সময় নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় এবং দলনেতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে এবং তাঁর আদেশ মানতে হয়। ক্যাম্পিংয়ে যে-সব গুণের দরকার, পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে সেগুলি আরও বহুগুণ বেশি দরকার। কারণ, পর্বতারোহণের অনেকখানিই ক্যাম্পিং। নীচে পৃথকভাবে পর্বতারোহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পর্বতারোহণ

মানুষ নানা প্রয়োজনে দীর্ঘদিন ধরেই পর্বতে উঠেছে। সুইজারল্যাণ্ডের রিফেলহর্ণ পর্বতের শীর্ষে ব্রোঞ্জ-যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু পাহাড়-পর্বতে যে কোনও রকমের বেড়ানো বা এমনি আরোহণ করাকে পর্বতারোহণ বলা হয় না। যখন কোনও কিছু লাভ করার জন্যে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কেউ কখনও পর্বতে উঠছে না, পর্বতে 'আরোহণ করার জন্যেই আরোহণ' করছে, শুধু তখনই পর্বতারোহণ ক্রীড়া-কৌশলের পর্যায়ে উন্নীত হয়। খেলাধূলা যেমন মানুষকে আনন্দ ও উত্তেজনা দেয়, তেমনই পর্বতারোহণেও রয়েছে আরও বেশি আনন্দ এবং উত্তেজনা। বস্তুতঃ, পর্বতারোহণকে বর্তমান যুগের অন্যতম দুরূহ ও শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-কৌশল হিসাবে ধরা হয়।

পাশ্চাত্যেই পর্বতারোহণের চেষ্টা প্রথম হয়েছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকে বলেন ১৪৯২ সালে ফরাসীরাজ অষ্টম চার্লসের আদেশে মাউন্ট আগুলে অভিযানই বিশ্বের প্রাচীনতম পর্বতাভিযান। প্রায় ৬,৯০০ ফুট (২,১০৩.১২ মিটার) উঁচু এই শিখরে তিনদিন ছিলেন আঁতোইন দ্য ভিল এবং তিনি এই অভিযানের বিবরণও রচনা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জুরিখ শহরে প্রথম সুব্যবস্থিতভাবে

পর্বতারোহণ সমিতি গড়ে উঠেছিল। এরপর ১৭৮৭ সালে বিশিষ্ট সুইস প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হোরেস বেনেডিক্ট দ্য স্যাসিওর এবং বামেত নামে এক স্ফটিক-সংগ্রহকারী আল্পস পর্বতমালার উচ্চতম শিখর মণ্টব্লাঙ্কে



পর্বতারোহণ

(১৫,৭৮১´/৪,৮১০ মি.) ওঠেন। ক্রমশঃ পর্বতারোহণের জনপ্রিয়তা বেড়ে যেতে থাকে এবং আরও অধিক-সংখ্যক লোক পর্বতারোহণে আকৃষ্ট হয়। বিখ্যাত ওয়েটার্ণহর্ণ শৃঙ্গ (১২,৮৬৮´/৩,৯২২ মি.) বিজিত হয় ১৮৫৪ সালে। অল্পদিন বাদেই বিশ্ববিখ্যাত অ্যালপাইন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৭ সালে। এই সময় থেকেই পর্বতারোহণ যথার্থ ক্রীড়া হিসাবে জনপ্রিয় হয়। আরম্ভ হয় পর্বতারোহণের সুবর্ণ যুগ। নরওয়ে ও কর্সিকার পর্বতে এবং ককেশাস পর্বতমালায় সুসংগঠিত অভিযান এর পরই শুরু হয়। ১৮৬৮ সালে ইউরোপের উচ্চতম শিখর এলব্রুজ (১৮,৪৬৮´/৫,৬২৯ মি.) জয় করেন ব্রিটিশ অভিযাত্রীরা। একত্রিশ বছর বাদে একটি জার্মান দল আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারোর (১৯,৫৯০´/৫,৯৭১ মি.) শীর্ষে আরোহণ করেন। ব্রিটিশ অভিযাত্রীরা আবার সাফল্য লাভ করেন ১৮৯৭ সালে পশ্চিম গোলার্ধের উচ্চতম শিখর আকাঙ্কাওয়া (২২,৮৩৪´/৬৯,৬০ মি.) জয় করে। এশিয়ার, তথা পৃথিবীর উচ্চতম শিখর এভারেস্ট (২৯,০২৮´/৮,৮৪৮ মি.) বিজিত হয় ১৯৫৩ সালে, শীর্ষে আরোহণ

করেন ব্রিটিশ অভিযাত্রীদলের নিউজিল্যাণ্ডবাসী সদস্য এডমণ্ড হিলারী ও ভারতের তেনজিং নোরগে।

পর্বতাভিযানের সাফল্যের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি, সাজ-সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দরকার। আর চাই আরোহীদের উপস্থিত-বুদ্ধি, স্থির মস্তিষ্ক, দৈহিক বল এবং যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার—শারীরিক পটুতা। এ ছাড়া পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া, সহযোগিতা এবং দলনেতার প্রতি চূড়ান্ত আস্থা যে প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য। এককথায় বলা যায় ক্যাম্পিং ও পদযাত্রার এক বৃহৎ ও দুরূহ সংস্করণ হল পর্বতারোহণ।

পর্বতারোহণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—শৈলারোহণ এবং বরফারোহণ। প্রকৃত আরোহণকারীরা দু'টিতেই পারদর্শী হয়। পর্বতারোহণে যে-সব সাজ-সরঞ্জামের দরকার তার মধ্যে মোটা এবং শক্ত নাইলনের দড়ি ও মজবুত 'মাউন্টেনিয়ারিং সু' বা পর্বতারোহণের জুতো উল্লেখযোগ্য। এই আরোহণে পায়ের দক্ষ কাজের সাহায্যে নিরাপদ স্থান বেছে নিয়ে পা রাখতে হয়। সুতরাং আরোহীর দু'টি পা ও পায়ের পাতাকে ভালোভাবে কাজ করতে হয় এবং তার 'ব্যালান্স' বা ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। শুধু তাই নয়, শৈলারোহণে দড়ির ব্যবহার ভালোভাবে শিখতে হয়—বিশেষতঃ দড়ির 'নট্' বা গ্রন্থি বাঁধা। দড়ি ব্যবহার করে নিরাপদ জায়গায় থাকা এবং একে অপরকে আরোহণ করতে সাহায্য করাকে 'বিলেয়িং' বা 'বিলে করা' বলে।

বরফারোহণেও দড়ির ব্যবহার করতে হয় এবং একই রকমভাবে। কিন্তু বরফারোহণে দরকার বরফ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান এবং অতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জাম, বিশেষতঃ বরফ কাটার কুঠার ('আইস-অ্যাক্স' বা বরফ গাঁইতি)। বরফ কখনও শুক্‌নো ধুলোর মত, আবার কখনও এত কঠিন থাকে যে, বরফ-কুঠার দিয়ে ধাপ কেটে কেটে উপরে উঠতে হয়। এই কুঠার বা গাঁইতিগুলির মাথার একদিক

তীক্ষ্ণ ও ছুঁচলো এবং অপর দিকটি চ্যাপ্টা হয়। অনেক সময় বরফ-কুঠারের মাথা অবধি বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তাতে নোঙরের মত দড়ি আটকানোর সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়। বরফ-কুঠার ছাড়া আর একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হল বরফে হাঁটার জুতো। এই জুতোগুলিতে 'ক্র্যাম্পন' বা সাঁড়াশিজাতীয় একরকম যন্ত্র লাগানো থাকে। ক্র্যাম্পনে ৮ বা ১০টি ইস্পাতের কাঁটা থাকে, ফলে বরফে হাঁটলে পা পিছলে যায় না।

পর্বতারোহণে প্রচুর সাজ-সরঞ্জামের (এবং অর্থের) দরকার হয়। ১৯৬০ সালে কাবরু শিখর অভিযাত্রীদলের সঙ্গে যে-সব জিনিসপত্র ছিল, তা ১৯ টন (১৯.৩ মেট্রিক টন) ওজনের। ওই জিনিসপত্র বইবার জন্যে ছিল ৮০০ জন শেরপা, শেরপানী ও নেপালী কুলি। এদের রোজ চার টাকা করে দিতে হত। সুতরাং অভিযানে যে মোট ছয় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তাহলে বুঝতেই পারছো, ক্যাম্পিং কিংবা হাইকিংয়ের ক্ষেত্রে যে-সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার হয়, সেগুলি ছাড়া আরও অনেক কিছুই পর্বতারোহীর দরকার। তাঁবু, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশেষতঃ বায়ু-নিরোধক জ্যাকেট, উচ্চতা মাপার যন্ত্র, ঔষধপত্র ও চিকিৎসার সরঞ্জাম, ম্যাপ, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, স্লীপিং ব্যাগ, ক্যামেরা ও ফিল্ম, ক্র্যাম্পন —এ সবই চাই।

এ ছাড়া যাতে প্রখর সূর্যরশ্মিতে শরীরে ফোস্‌কা না পড়ে বা ঠোঁট ফেটে না যায়, তার জন্য অ্যান্টি-সানবার্ণ ক্রীম ব্যবহার করা হয় এবং আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি লেগে যাতে চোখের ক্ষতি না হয়, সে-জন্যে বিশেষ গগল্‌স্‌ও আরোহীরা ব্যবহার করেন।

পর্বতারোহণে পদে পদে বিপদ। শুধু অজানাকে জানবার ও অজেয়কে জয় করবার নেশায় পাগল হয়েই অভিযাত্রীরা 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' অবস্থায় অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আছে হিমানী-সম্প্রপাত, অবিরাম তুষারপাত, তুষার-ঝঞ্ঝা,

ধস্ ইত্যাদি কত বিপদ। এ ছাড়া, যখন-তখন আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা তো আছেই। সুতরাং আরোহীদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয় এবং কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন—যা স্পষ্টই নিজের আয়ত্তের বাইরে সেটার চেষ্টা করা উচিত নয়। অনভিজ্ঞ আরোহীদের পক্ষে একা পর্বতে ওঠা অনুচিত। অসুস্থ বা পরিশ্রান্ত অবস্থাতেও ওঠা উচিত নয়। পশ্চাদপসরণ প্রয়োজন হতে পারে যে কোনও সময়েই। কাজেই তার রাস্তা বা 'এস্কেপ-রুট' ভালো করে জেনে রাখা দরকার। রাত্রি হবার আগেই 'ক্যাম্প' বা শিবিরে ফিরে আসা উচিত। কুয়াশা আরম্ভ হওয়া মাত্রই আর এগোবার চেষ্টা করা উচিত নয়। ম্যাপ এবং কম্পাসের সঠিক ব্যবহার জানা থাকা উচিত।

ভারতবাসী পর্বতারোহণে আকৃষ্ট হয় ১৯৫৩ সালের সফল হিমালয় অভিযানের পর। পর্বতারোহণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ-দানের জন্য ১৯৫৪ সালে দার্জিলিঙে 'হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পিছনে ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা। বাঙালীর পর্বতারোহণ প্রচেষ্টা খুব বেশিদিনের না হলেও এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে চল্লিশটিরও বেশি অভিযান সংগঠিত হয়েছে এবং এর তিন-চতুর্থাংশই সফল হয়েছে। ১৯৬৭ সালের রোন্টি অভিযানের পর থেকে বাঙালী মেয়েরাও পর্বতারোহণে অংশগ্রহণ করছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পর্বতারোহণের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'সুরেশ-কুমার মেমোরিয়াল শীল্ড' এ পর্যন্ত যে তিনবার দেওয়া হয়েছে, সেই তিনবারই পশ্চিমবঙ্গের অভিযাত্রীদল এই পুরস্কার পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হিমালয় ও পর্বতারোহণ সম্পর্কিত প্রায় চল্লিশটি সংঘ বা সংগঠন আছে। কেন্দ্রীয় সংগঠনটির নাম 'হিমালয়ান ফেডারেশন'।

পর্বতারোহণে আজ পর্যন্ত কত অভিযাত্রী যে প্রাণ দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। ১৮৯৫ সালে হিমালয়ের নাঙ্গা (২৬,৬৬০'/৮,১২৬ মি.)

শিখর অভিযান করতে গিয়ে অভিযাত্রীদলের নেতা এ. এফ. মামারী এবং আরও দু'জন মারা যান। আজ পর্যন্ত নাঙ্গায় ৩২ জনের প্রাণহানি ঘটেছে।

ম্যাডাম ক্লড স্লোগান মুন, ক্লড ভ্যানডার স্ট্রাটলেন, মিস্ হিল্ডা রিচমণ্ড, ম্যালোরী, আরভিন, নান্দু জয়াল, এন. চক্রবর্তী, অনিমা সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গসুন্দর চৌধুরী, অমর রায়, সুজয়া গুহ, কমলা সাহা এঁরা বিভিন্ন অভিযানে প্রাণ হারিয়েছেন।

কিন্তু তবুও পর্বতারোহণ বন্ধ হয়নি। হবেও না। পর্বতের আহ্বান মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না। সে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। সাফল্য আসবেই এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু যে মনোবল নিয়ে মানুষ চাঁদের মাটিতে পা রেখেছে, মঙ্গলগ্রহে যাবার কথা ভাবছে, দুর্গম মেরুদেশে বার বার অভিযান করেছে—সেই মনোবলই তার পর্বতারোহণ প্রচেষ্টার পিছনে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের জয়যাত্রা চলবেই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেবল ছাত্রীদের জন্য কয়েকটি খেলা

ক্যাপ্টেন বল ঃ ৪৫.৭২ মিটার বা ৫০ গজ দূরে দু'টি চেয়ারের উপরে দু'জন উঁচু বা লম্বা খেলোয়াড় থাকবে। উদ্দেশ্য বিপরীত দিকের চেয়ারের উপরে দাঁড়ানো খেলোয়াড়ের কাছে বল পাস দেওয়া। মাঠের নির্দিষ্ট আয়তনের প্রয়োজন নেই। একটি দলে ২০ জন করে খেলা যায়। এতে বাস্কেটবলের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে হয়।

এ ছাড়া ৪৫.৭২ বর্গমিটার বর্গক্ষেত্রাকার মাঠের চার কোণে চারজন ক্যাপ্টেনকে চেয়ারের উপর বসিয়ে রাখা হয়। চারজন ক্যাপ্টেনের খেলায় বিপক্ষের দু'জন ক্যাপ্টেনের যে কোনও একজনের হাতে বল পাস করা যায়।

ডজ বল ঃ ছাত্রীরা দু'টি দলে ভাগ হবে। একটি দল একটি বড় বৃত্তের বাইরে চিহ্নিত জায়গাগুলিতে দাঁড়াবে। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা বৃত্তের ভিতরে ছড়িয়ে থাকে। যারা বাইরে থাকে তারা বল (ভলিবল বা ফুটবল) ছুঁড়ে মারে ভিতরের খেলোয়াড়দের। ওরা আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেতে বল নাচায়, ডজ করে, তবে কখনও বৃত্তের বাইরে যেতে পারে না। বাইরের খেলোয়াড়রা সরাসরি ভিতরের খেলোয়াড়ের গায়ে বল মারতে পারলে সেই খেলোয়াড় 'মরে' যায় বা আউট হয়। এইভাবে আউট হতে হতে শেষ যে থাকে, তাকে 'বৃত্তের রাণী' বলা হয়। এর পর ভিতরের খেলোয়াড়রা যায় বাইরে। বাইরের ওরা আসে ভিতরে।

থ্রো বল ঃ সরঞ্জাম—ফুটবল অথবা নেটবল। মাঠ লম্বায় ১৮.২৯ থেকে ২১.৩৪ মিটার হবে। চওড়া আন্দাজমত করতে হয়। আয়তক্ষেত্রাকার মাঠটিকে মাঝে লাইন টেনে দু'ভাগ করতে হবে। তারপর দু'দিকের পিছনের লাইন থেকে ভিতরে ৯১ সেন্টিমিটার বা ১ গজ সমান্তরাল লাইন টানতে হবে দু'দিকে। উভয় দিকে ওই ১ গজ (৯১ সে.মি.) এলাকায় প্রতি দলের ৪ জন খেলোয়াড় থাকে। আর মাঝ

লাইনের দু'দিকে দু'দলে ৬ জন করে। ১ গজ (৯১ সেমি.) এলাকায় যারা থাকে, তারা 'ক্যাচার', আর যারা মাঝ-লাইনের দু'দিকে থাকে, তারা 'থ্রোয়ার'। এই খেলায় এক দলের 'থ্রোয়ার'রা যেদিকে থাকে, তার বিপরীত দিকে থাকে তাদের 'ক্যাচার'রা। অর্থাৎ এক দলের থ্রোয়ার ও ক্যাচারের মাঝে থাকে বিপরীত দলের থ্রোয়াররা। মাঝে-থাকা থ্রোয়ারদের কাটিয়ে বল পাঠাতে হয় নিজ দলের ক্যাচারদের কাছে।

সাইড-লাইন থেকে বল ছুঁড়ে মাঝমাঠে ফেললে খেলা শুরু হয়। থ্রোয়ার সেই বল ধরে তাদের ক্যাচারদের কাছে পাঠায় এবং ক্যাচার ধরলে ১ পয়েন্ট হয়। বল ধরে ক্যাচার আবার নিজেদের থ্রোয়ারের কাছে পাঠায়। ক্যাচ আইনসিদ্ধ না হলে বিপক্ষের থ্রোয়ার বল পায়। থ্রোয়ার যখন নিজ দলের ক্যাচারের কাছে বল ছোঁড়ে, তখন বিপক্ষ থ্রোয়াররা বাধা দিয়ে বল দখল করতে পারে।

রিলে রেস

হপিং রিলে ঃ খেলোয়াড়রা ৬ বা ৪টি দলে ভাগ হবে। নির্দিষ্ট লাইনের পিছনে প্রতিটি দল দাঁড়াবে। প্রথম লাইনের সমান্তরালে বেশ কিছু দূরে আর একটি লাইন টানতে হবে। বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি দলের খেলোয়াড়রা এক পা তুলে ছুটতে ছুটতে দূরে টানা লাইন অতিক্রম করে আবার আগেকার জায়গায় ফিরে এসে নিজ দলের দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে স্পর্শ করে। দ্বিতীয়জন একইভাবে যায় ও ফেরে। এইভাবে সমসংখ্যক খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা আগে দৌড় শেষ করে তারাই বিজয়ী হয়।

বল পাস রিলে ঃ প্রতি দলের খেলোয়াড়রা ৩.৫ মিটার বা ১০ ফুট পর-পর দাঁড়ায়। প্রত্যেক দলকে একটি করে বল দেওয়া হয়। বাঁশী বাজার- সঙ্গে সঙ্গে প্রথমজন বল পাস করে দ্বিতীয়জনকে, দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে। এইভাবে শেষ খেলোয়াড় পর্যন্ত বল পাস করার পর আবার অনুরূপভাবে বল এক নম্বর খেলোয়াড়ের

কাছে ফিরে আসে। যারা আগে পাস শেষ করে তারাই বিজয়ী হয়।

সার্কল পাস রিলে : একই মাপের দু'টি বৃত্ত আঁকতে হবে। সমসংখ্যক দু'টি দলের খেলোয়াড়রা পরিধির উপরে দাঁড়াবে। বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে উভয় দলের অধিনায়ক বল পাস দেবে। ঘড়ির কাঁটার মত বল ঘুরবে এক হাত থেকে অন্য হাতে। যারা আগে শেষ খেলোয়াড়ের কাছে বল পৌঁছে দিতে পারবে, তারাই জয়ী হবে।

চ্যারিয়ট রেস : প্রতি দলে ৪ জন করে খেলোয়াড় থাকে। প্রতিটি দল ৪টি গ্রুপে ভাগ হয়। প্রত্যেকটি দল একে অন্যের কোমর ধরে দাঁড়ায়। প্রতি দলের প্রথম গ্রুপের খেলোয়াড়রা স্টার্টিং লাইনে দাঁড়ায়। বাঁশী বাজলে নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে ফিরে আসে স্টার্টিং-লাইনে। তখন দ্বিতীয়জন দৌড় শুরু করে। চারজন এইভাবে দৌড়য়। যারা আগে দৌড় শেষ করে তারাই বিজয়ী ঘোষিত হয়।

ব্রতচারী নৃত্য ও সংগীত

ব্রতচারীর প্রবর্তক পরলোকগত গুরুসদয় দত্ত। আজকের আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে এর গুরুত্ব নেই, কিন্তু দেহ ও মন সুস্থ এবং প্রফুল্ল রাখার জন্য ব্রতচারীর জুড়ি মেলে না। সত্যিকারের মানুষ হওয়ার পথে যেমন, তেমনি পল্লী-সংস্কৃতিকে রক্ষণাবেক্ষণের মহান অবদান ব্রতচারীর কর্মধারায়।

'গুরুজী'—গুরুসদয় দত্ত ১৮৮২ সালের ১০ মে জন্মগ্রহণ করেন। এবং পরলোকগমন করেন ৫৯ বছর বয়সে ১৯৪১ সালের ২৫ জুন।

আমাদের ধারণা 'গুরুজীর' প্রদর্শিত পথে চললে সমাজ বর্তমান অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবে, ঘুচবে নানা অর্থ নৈতিক সমস্যাও।

ব্রতচারী : বাংলার প্রতিজ্ঞা ; ব্রতচারীর ষোল পণ ;
ভূমিপ্রেমের তিন উক্তি ;

(১) "মোদের বাংলাভূমির মাটি ;"

(২) "চল্ আয় কচুরি নাশি ;"

(৩) "বাংলাভূমির প্রেমে আমার প্রাণ হৈল পাগল ;"

(৪) "আরে ভালো ভালো ভালোরে ভাই ;"

(৫) "কাইয়ে ধান খাইলো রে ;"

(৬) "হাতে হাতে ধরা-ধরি তালে তালে পায়ে ;"

(৭) "আমরা বাঙালী সবাই বাংলা মার সন্তান ;"

(৮) "ও ধান ভানোরে ভানোরে মুরলী গান শুনি"—ইত্যাদি

(৯) "চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই।
যত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই পালাই,
পেটের খিদের জ্বালায়
খাব ক্ষীর আর মালাই।
চল্ কোদাল চালাই…"

জাতীয় সংগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,   তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খেলাধূলা আগে ছিল সখের। বর্তমানকালে জাতি গঠনে এর ভূমিকা যথেষ্ট। সুস্থ শরীর ও মানসিক প্রফুল্লতার জন্যও শরীর-চর্চা অপরিহার্য। তাই উন্নত দেশগুলিতে ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মতই 'খেলাধূলা' আবশ্যিক পাঠ্য। ভারতের অনেক রাজ্যের শিক্ষাক্রমেও অনুরূপভাবে শরীর-চর্চাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎও ১৯৭৪-এর শিক্ষাবর্ষে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শারীর-শিক্ষা আবশ্যিক করে দিলেন। এর মোট নম্বর ৩০ (দলগত খেলার জন্য ৫, ব্যক্তিগত খেলার জন্য ২০ ও সর্বাধিক কৃতিত্বের জন্য ৫)।

আমাদের প্রকাশিত **"খেলাধূলার আধুনিক নিয়ম-কানুন"** পর্ষৎ-প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত। এর প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য এবং দ্বিতীয় খণ্ড নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট। গ্রন্থ দু'খানি ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে এলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব।

প্রকাশক

